দুষ্টু প্রজাপতি

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

তুলি-কলম
১, কলেজ রো, কলকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ
আষাঢ়, ১৩৬৭

প্রকাশক
কল্যাণব্রত দত্ত
তুলি-কলম
১, কলেজ রো, কলকাতা-৯

মুদ্রক
ফণীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
অবলা প্রিণ্টার্স
২৫।৩ তারক চ্যাটার্জী লেন, কলকাতা-৫

প্রচ্ছদ-শিল্পী
সত্য চক্রবর্তী

এই লেখকের

বন্দী

অভিনয় নয়

নিবেদং মিদং

মানে না মানা

শহর থেকে দূরে

বেশ নাম গলিটার। শিউলিতলা লেন।

কেন এই নামকরণ হ'লো আমরা জানি না। হয়তো বা কোন কালে ছিল একটা শিউলিফুলের গাছ। এখন আর সে গাছের কোন চিহ্ন সেখানে নেই।

কলকাতা শহরে বাগবাজারের দিকে গেছেন কখনও? বাগ-বাজারে ঢুকে সোজা চলে যাবেন গঙ্গার দিকে। দেখবেন, বড় রাস্তার পাশেই প্রকাণ্ড একটা রাজবাড়ীর মতন বাড়ী। সেই বাড়ীর পাশ দিয়ে একটা রাস্তা বেরিয়ে গেছে। ঢুকে পড়ুন সেই রাস্তায়। ঢুকেই সোজা চলে যান উত্তরমুখে। এদিক ওদিক তাকাবেন না। বাঁদিকের একটা ঘরে ছেলেদের ক্লাব। দিবারাত্রি সেখানে হৈ-হুল্লোড় হট্টগোল চলছে। থম্‌কে দাঁড়াবেন না। দাঁড়িয়েছেন কি মরেছেন। জনকল্যাণকামী এই সব ছেলেরা হয়ত ভেবে বসবে, আপনি বিপদে পড়ে তাদের শরণাপন্ন হয়েছেন। জিজ্ঞাসা করবে, আপনি কোথায় যাবেন? কোথেকে আসছেন?

কিন্তু শুধু পথের নিশানা জানবার জন্যে আপনি তাদের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন, সে-কথা অবিশ্বাস করার মত বুদ্ধিমান যুবক সেখানে থাকতেও পারে। আপনাকে একজন দুষ্কর্ম্মকারী প্রতারক ভাবাও বিচিত্র কিছু নয়। কাজেই তাদের প্রশ্নের জবাব দিতে দিতে আপনি হয়রাণ হয়ে পড়বেন। অনর্থক আপনার সময় নষ্ট হবে।

তার চেয়ে সোজা আপনি এগিয়ে যান। রাস্তার বাঁদিকে দেখবেন একটি কদমের গাছ। বর্ষাকালে যদি যান তো কদমফুলের গন্ধ পাবেন। এইখানে একটিবার আপনাকে তাকাতেই হবে

গাছটার দিকে। সাদা সাদা অজস্র কদমের ফুল ফুটেছে দেখবেন।' সেই কদমগাছের তলা দিয়ে একটি রাস্তা বেরিয়ে গেছে। এই রাস্তা ধরে পশ্চিমমুখে খানিকটা যাবার পরেই দক্ষিণদিকে যে-রাস্তাটা বেরিয়েছে, ঢুকে পড়বেন সেই রাস্তায়। বাস্, আর আপনাকে খুঁজতে হবে না। খান পাঁচ-ছয় বাড়ীর পরেই দেখবেন একটি লাইটপোষ্ট; আর সেই লাইটপোষ্টের গা ঘেঁসে চওড়া যে রাস্তাটা বেরিয়েছে, সেটাকে প্রথমে গলি রাস্তা বলে মনেই হবে না আপনার। তবু আপনি ঢুকে পড়বেন সেইখানে। বাঁদিকে তাকাবেন। দেখবেন, একটা বাড়ীর দেওয়ালের গায়ে নীলরঙের টিনের পাতের ওপর সাদা অক্ষরে লেখা—শিউলিতলা লেন।

ছোট্ট গলি। কয়েকখানা মাত্র বাড়ী। কিন্তু এর আর একটা বিশেষত্ব আছে।

গলিতে ঢোকবার মুখটা খোলা, কিন্তু বেরোবার মুখটা বন্ধ। কাজেই এই শিউলিতলা লেনকে অনেকে বলে, ব্লাইণ্ড লেন। কেউ-বা বলে বন্ধ গলি। কেউ বলে, কানা গলি। এই নিয়ে ফণীবাবু মাঝে মাঝে রসিকতা করেন। গলিতে ঢুকেই ডানদিকের প্রথম দোতলা বাড়ীখানি ফণীবাবুর। ফণীবাবু বলেন, তা আমাদের গলিটাকে লোকে কানাই বলুক আর যাই বলুক, আমরা যে-ক'জন আছি এই গলিতে, আমরা কেউ কানা নই। না, কি বল বিশু?

বিশু তাঁর বাড়ীর সুমুখের উঁচু রকের ওপর বসে বসে ঘড়ি মেরামতের কাজ করে।

তা সে এই কাজ করছে আজ দশ বছর ধরে। রকের সুমুখের ঘরখানি বিশু বলে, মাসিক পাঁচ টাকায় ভাড়া নিয়েছে। পাঁচ টাকায় ওই অত বড় ঘরখানা ভাড়া দেবার মত দুরবস্থা ফণীবাবুর নয় যদিও, তবু এই কথাটার মধ্যে সত্য খানিকটা আছে।

সে আজ দশবছর আগের কথা।

বাড়ীর ভেতর থেকে ফণীবাবু তখন সবে তাঁর এই রকে এসে

বসেছেন, ছোট একটি ক্যাম্বিসের ব্যাগ হাতে নিয়ে এই বিশু এসে দাঁড়াল তাঁর সুমুখে। ব্যাগ সমেত হাতদুটি কপালে ঠেকিয়ে একটি নমস্কার করে বললে, প্রণাম।

ফণীবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, কি চাই ?

বিশু বললে, ঘড়ি।

ফণীবাবু তার কথাটা প্রথমে বুঝতে পারেননি। খানিক ভেবে বললেন, ঘড়ি ? ওই যে টিক্ টিক্ করে চলে সেই ঘড়ি ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

ফণীবাবু বললেন, এটা তো ঘড়ির দোকান নয় বাবা। ঘড়ি এখানে কোথায় ? তুমি বাবা ভুল করে এসেছ। রাধাবাজারে যাও। মেলা ঘড়ি পাবে।

বিশু বললে, আজ্ঞে না, আমি নতুন ঘড়ি চাই না, আমি চাই ভাঙা পুরানো অচল ঘড়ি। ঘড়ি আমি মেরামত করি।

হো হো করে হেসে উঠলেন ফণীবাবু। বললেন, তাই বল। ডাকলেন, সুন্দর! সুন্দর!

সুন্দর ফণীবাবুর ছেলের নাম। তাঁর এই একটি মাত্র ছেলে। বড় একটি মেয়ে আছে তার শ্বশুর বাড়ীতে। বাড়ীতে আপনার বলতে কেউ নেই।

সুন্দর তখন প্যাণ্টের ওপর সার্ট পরছে। দোতালা থেকে জবাব দিলে, যাই বাবা।

বিশু তখন উৎসাহিত হয়ে বলতে আরম্ভ করেছে, ঘড়ি মানে বুঝেছেন—ঘড়ির শুধু কঙ্কালটা যদি আমি পাই, তাকে আমি নতুনের মত করে দিতে পারি।

চটি পায়ে দিয়ে সুন্দর এসে দাঁড়ালো।

ফণীবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, বাড়ীতে আমাদের অচল ঘড়ি আছে ?

সুন্দর বললে, হোয়াট্ ডু ইউ মিন বাই অচল ? একদম চলে না, না, চলে অথচ করেক্ট্ টাইম্ দেয় না ?

বিশু বলে উঠলো, একই কথা। যে-ঘড়ি চলে অথচ ঠিক সময় দেয় না সে-ঘড়ির না চলাই উচিত।

বিশুর দিকে নজর পড়লো সুন্দরের। বললে, হু আর ইউ?

বিশু ইংরাজীতে জবাব দিলে। বললে, ওয়াচ রিপেয়ারার।

সুন্দর বললে, তোমাকে জানি না চিনি না, ওয়াচগুলি তোমার ওই ব্যাগের ভেতর পুরে যদি হাওয়া হয়ে যাও, তখন?

বিশু বললে, আজ্ঞে না, এইখানে সিটিং সিটিং আমি কাজ করবো।

'অল রাইট্' বলে সুন্দর বাড়ীর ভেতর চলে গেল। খানিক পরে ফিরে এলো একজন চাকরকে সঙ্গে নিয়ে। চাকরের মাথার ওপর একটা ঝুড়িতে বসানো তিনটে বড় বড় ক্লক, আর তার নিজের পকেট থেকে বের করে দিলে দুটো ছোট ছোট হাতঘড়ি। বললে, রিপেয়ার ওয়েল, অর আই উইল রিপেয়ার ইউ।

এতগুলো ঘড়ি দেখে বিশু তখন আনন্দে আত্মহারা।

সুন্দর বেরিয়ে যাচ্ছিল। ফণীবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, আজ তোমার ইস্কুল নেই?

যেতে যেতেই সুন্দর বলে গেল, নো। আজ সান্‌ডে।

—তাই তো। আজ রোববার, আমার মনে ছিল না। বলেই তিনি বিশুর দিকে ফিরলেন—একদিনে পারবে?

বিশু বললে, দেখি। চেষ্টা করি।

ফণীবাবু তাঁর রাঁধুনী-ঠাকুরকে ডাকলেন। ডেকে বলে দিলেন, আজ একজন খাবে। চাল নিও।

একদিনের জায়গায় পাঁচদিন লাগিয়ে দিলে বিশু। তবে হ্যাঁ, ঘড়িগুলো সেরেছে চমৎকার। সুন্দর বললে, ঘড়ি সারতে জানে লোকটা।

এই না শুনে এদিক ওদিক থেকে আরও তিন চারটে ঘড়ি এসে গেল বিশুর হাতে।

টাকাকড়ি মিটিয়ে দিয়ে ফণীবাবু বললেন, এবার তাহলে তুমি এসো।

কিন্তু এসো বললেই কি আসা যায় নাকি?

সে তখন বেশ কায়েমি হয়ে বসেছে বাইরের ঘরখানায়। খাট এসেছে, বিছানা এসেছে, একটা টেবিল আর একটা চেয়ার তো ছিলই। পঁচিশ পাওয়ারের বাল্‌ব্‌টা পর্যন্ত বদলে একশো পাওয়ারের হয়ে গেছে। বিশু তার হাত দুটি জড়ো করে বললে, ব্রাহ্মণ আপনি, গরীবকে আশ্রয় যখন দিয়েছেন—

ফণীবাবু বললেন, যাক্‌ আর বলতে হবে না। বুঝেছি। তোমার মেয়েছেলে কোথায় আছে?

বিশু বললে, বিয়েই করিনি হুজুর, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আমার কেউ কোথাও নেই।

ফণীবাবু বললেন, থাকো তাহ'লে এইখানেই। কিন্তু শোনো, নিজে রান্না করে নেবে কাল থেকে। আর ওই ঘরটার জন্যে মাসে মাসে অন্তত কিছু ক'রে দিও আমাকে।

বিশু নিজেই বলেছিল, পাঁচ টাকা করে দেবে।

কিন্তু এই দশ বছরে দশটি টাকা সে দিয়েছে কিনা সন্দেহ।

দশ বছর পরের কথা বলছি। এই দশ বছরে অনেক কিছু হয়ে গেছে। অনেক জল বয়ে গেছে পুলের তলা দিয়ে।

পরাধীন ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে। বিশুর ঘড়ির দোকানটা বড় হয়েছে। ফণীবাবুর বয়স বেড়েছে। ফণীবাবুর ছেলে সুন্দর লায়েক হয়েছে। সুন্দর আজকাল ধুতি পরে না, সুট পরে। সব সময়েই দেখা যায় সুট পরে সাহেব সেজে ঘুরে বেড়ায়।

কেনই-বা বেড়াবে না, তার অভাব কি? বাপের অনেক পয়সা।

সেদিন সকালে দেখা গেল, চমৎকার একটি দামী সুট পরে সুন্দর বেরিয়ে এলো বাড়ী থেকে। হাতে ছড়ি নিয়েছে, চোখে গগল্‌স্‌ পরেছে, বুক পকেটে একটা খুব দামী পাইপের মাথাটা দেখা যাচ্ছে। বাড়ী থেকে বেরিয়েই দোরের কাছে থমকে থামলো। দাওয়ায় বসে বসে বিশু ঘড়ি সারছিল, জিজ্ঞাসা করলে, বাবা কোথায় বিশু ?

বিশু তার চোখে আই গ্লাস দিয়ে হেঁটমুখে ঘড়ি সারছে। কার বাবা যে কোথায়, তার খবর সে জানবে কেমন করে ?

মুখ না তুলেই বিশু বললে, উঁ।

কিন্তু তার আগেই সুন্দর দেখতে পেলে তার বাবাকে। শিউলিতলা লেনের ভেতর কারও বাড়ী বোধহয় গিয়েছিলেন ফণীবাবু। সেখান থেকে বেরিয়ে তিনি তাঁর বাড়ীর দিকেই আসছিলেন।

তাই দেখেই সুন্দর তাড়াতাড়ি চলে গেল বড় রাস্তার দিকে।

ফণীবাবু সেটা দেখলেন। বাড়ীর রকে এসে ভাল করে চেপে বসলেন। বললেন, সায়েব বেরুলেন বুঝি ?

বিশু বললে, হ্যাঁ, জিজ্ঞাসা করছিল বাবা কোথায় ? আপনাকে দেখতে পেয়েই বোধহয় পালালো।

ফণীবাবু বললেন, Businessman কিনা, তাই সব সময়েই busy.

বিশু জিজ্ঞাসা করলে. কিসের business ?

ফণীবাবু গম্ভীরমুখে বললেন, ভেরেণ্ডা ভাজার business.

বিশু বললে, সে আবার কি ?

—সে সব তুমি বুঝবে না। তুমি যে business করছো তাই কর। বলেই তিনি তাঁর চাকরের নাম ধরে ডাকলেন, সীতারাম চা দিয়ে যা।

সীতারাম চা তখনও দিয়ে যায়নি, ফণীবাবু তাকিয়ে দেখলেন

তাঁর সুমুখে এসে দাঁড়িয়েছে একজন যুবক আর তার সঙ্গে এক যুবতী। ছেলেটির বয়স বছর-পঁচিশেক, আর মেয়েটির বয়স সতেরো কি বড় জোর আঠারো। তন্বী, তরুণী। দেখতে ভারি সুন্দর। চোখ পড়লে সহজে চোখ ফেরানো যায় না।

ছেলেটির বগলে একটি বিছানার বাণ্ডিল, আর মেয়েটির হাতে একটি চামড়ার সুটকেশ।

ছেলেটি আগে কথা বললে, দেখুন, এক-আধখানা ঘর এখানে পাওয়া যাবে? ভাড়া?

ফণীবাবু বললেন, ঘর ভাড়া? কলকাতা শহরে? নাঃ।

ছেলেটি আবার বললে, পাব না? কোথাও একখানা ঘর খালি নেই?

ফণীবাবু বললেন, আজ্ঞে না। আজকাল গরীবের পেট ছাড়া আর কিছু খালি নাই।

এ-কথা শোনবার পর আর এখানে দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই। ছেলেটি আর মেয়েটি বেরিয়ে যাচ্ছিল শিউলিতলা লেন থেকে। পেছনে ডাক শুনে থমকে থামলো দুজনেই—শুনুন!

ছেলেটি ফিরে তাকিয়ে বললে, আমাকে ডাকছেন?

ফণীবাবু বললেন, হ্যাঁ।

দুজনেই ফিরে এলো। ছেলেটি বললে, আমাকে আপনি শুনুন বলছেন কেন? আমি আপনার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট। আমার নাম বিনয়। বিনয় ঘোষ।

ফণীবাবু বললেন, আজকালকার ছেলে বাবা তোমরা। তুমি বলবার সাহস আমার নাই। তবু বলছি। শোনো, তোমরা কি পালিয়ে এসেছ দুজনে?

বিনয় বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ।

ফণীবাবু বললেন, লভ্?

কথাটা বিনয় প্রথমে বুঝতে পারেনি। জিজ্ঞাসা করলে, মানে?

ফণীবাবু বললেন, লভ্ মানে জানো না? লভ্—লভ্। লভ্ মানে ভালবাসা।

—ও হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি।

—বুঝবেই তো। বোঝবার জন্যেই তো বলছি।

বিনয় এবার মেয়েটির মুখের দিকে তাকালো। বললে, রিণি, এঁকে প্রণাম কর্!

মাথা হেঁট করে ফণীবাবুকে রিণি প্রণাম করলে।

বিনয় বললে, আপনি একটা ভুল করেছেন। রিণি আমার সহোদর বোন। এই বলেই আবার তারা চলে গেল।

ফণীবাবু ভারি অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন।—এ হে হে হে—আমার মনটা কি রকম হয়েছে দেখেছ? বিশু, কি অন্যায় করে বসলাম দেখলে? এর জন্যে কে দায়ী বলতে পার? আমার ওই হতভাগা ছেলে।—চলে গেল নাকি? শোনো, শোনো, ওহে কি নাম বললে ভুলে গেলাম, শোনো!

আবার ফিরে দাঁড়ালো বিনয়।—আমাকে ডাকছেন?

—হ্যাঁ হ্যাঁ তোমাকেই ডাকছি। শোনো।

আবার ফিরে এলো বিনয় আর রিণি। বিনয় বললে, বলুন।

শিউলিতলা লেনের ভিতরের দিকে আঙুল বাড়িয়ে ফণীবাবু বললেন, ওই যে দেখছো ছোট একটি গলি দুখানা বাড়ীর মাঝখানে, ওই গলির ভেতরে ঢুকলেই বাঁহাতি দেখবে একটা দরজা। সেই দোরের সুমুখে দাঁড়িয়ে ওপরের দিকে মুখ করে খুব জোরে জোরে ডাকো গিয়ে—'পান্নালালবাবু! পান্নালালবাবু!' ছাখো যদি ওখানে 'একটা জায়গা পাও। পান্নালাল বাড়ীর দেয়াল পর্য্যন্ত ভাড়া দিয়ে এখন ছাতে গিয়ে উঠেছে। যদি জিজ্ঞেস করে কে পাঠিয়ে দিলে, বলবে—ফণী সরকার।

বিনয় বললে, যে আজ্ঞে।

বলে তারা এগিয়ে গেল পান্নালালের বাড়ীর দিকে।

এতক্ষণে একটু যেন নিশ্চিন্ত হলেন ফণীবাবু। নিশ্চিন্ত হয়ে পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে একটি সিগারেট ধরালেন। সিগারেটটি ধরিয়ে জ্বলন্ত দেশলাইএর কাঠিটি তিনি ছুঁড়ে ফেলে দিতে যাচ্ছিলেন, হাঁ হাঁ করে নিষেধ করলে চরণ-উকিল। বাজারের থলি হাতে নিয়ে সে এগিয়ে এলো ফণীবাবুর কাছে। মুখের বিড়িটি বাড়িয়ে ধরে বললে, এইটে ধরিয়ে নিই। দাও। কাঠিটা ফেলো না।

কাঠি তখন নিবে গেছে। আর একটি কাঠি জ্বালিয়ে তার বিড়িটি ধরিয়ে দিতে দিতে ফণীবাবু বললেন, উকিল হয়ে বিড়ি টানছো? এই নাও একটা সিগ্রেট খাও। বলেই তিনি তাঁর সিগারেটের প্যাকেট থেকে একটি সিগ্রেট বের করে চরণ-উকিলের হাতে দিয়ে বললেন, খাও।

সিগ্রেটটি পকেটে রেখে দিলে চরণ-উকিল। বললে, থাক্, আদালতে গিয়ে খাব। বিশু, ক'টা বাজলো?

বিশু বললে, ঘড়ি একটি কিনে নাও না দাদা। সস্তায় করে দেবো।

ফণীবাবু বললেন, কাকে বলছো বিশু, বিড়ি-খাওয়া উকিল কখনও ঘড়ি কেনে না। আর যদিই-বা কেনে, তোমার কাছ থেকে কিনবে কেন হে? খবরদার চরণ, এর কাছে ঘড়ি কিনো না। তোমার ন'টার সময় বারোটা বাজিয়ে দেবে।

চরণ বললে, ঘড়ি আমি কিনলে তো!

বিড়ি টানতে টানতে সে চলে গেল। চলে গেল প্রকাশবাবুর বাড়ির সুমুখ দিয়ে। প্রকাশের ভাই পরেশ বেরিয়ে এলো বাজারের থলে হাতে নিয়ে।

পরেশ হন্ হন্ করে একরকম ছুটতে ছুটতে বাজারে যাচ্ছিল, ফণীবাবু ডাকলেন, পরেশ! পরেশ!

পরেশ সাড়াও দিলে না, পেছন ফিরে একবার তাকিয়েও দেখলে না।

ফণীবাবু বললেন, আচ্ছা বিশু, এই পরেশ ছোড়াটার এত অহঙ্কার কবে থেকে হলো বলতে পারো ?

বিশু বললে, কে ? ওই প্রকাশবাবুর ভাই পরেশ ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, আমাদের এই শিউলিতলায় ওই একটা পরেশই আছে।

—ওর আবার অহঙ্কার কখন দেখলেন ?

--এক্ষুনি। ভাবলাম থলে হাতে বাজারের দিকে যাচ্ছে, এক প্যাকেট সিগ্রেট আনতে দিই, ডাকলাম তা হন্ হন্ করে চলে গেল চটি ফট্ ফট্ করতে করতে। লাটসায়েব যেন শুনতেই পেলেন না।

বিশু বললে, শুনতে পাবে না কেন ? শুনতে ঠিক পেয়েছে। এখানে সে দাঁড়াবে না।

—কেন ?

—আমার ভয়ে।

—তুমি কে হে লাটসায়েব যে তোমাকে ভয় করবে ?

বিশু বললে, ওকে আমি রিষ্ট্‌ওয়াচের একটা ব্যাণ্ড্ বিক্রি করেছি। আট আনা দাম। ছ'মাস হয়ে গেল দামটা আদায় করতে পারছি না। তাই পাছে পয়সা চাই ভেবে ও এদিকে মুখ ফিরিয়ে তাকায় না।

ফণীবাবু আশ্বস্ত হলেন কথাটা শুনে। বললেন, তাই বল। কিন্তু দ্যাখো, তুমি বাপু পাড়ার ছেলেদের জিনিষ গছিয়ে দিয়ে আর জ্বালিয়ো না। ছেলেটা বি-এ পাশ করেছে, কাজকর্ম কিছু একটা পেলেই তোমার পয়সা ও দিয়ে দেবে।

বিশু বললে, কাজ এ-বাজারে আর পেতে হবে না।

ফণীবাবু বললেন, কাজ না পায়, আমি দিয়ে দেবো তোমার পয়সা। আট আনা পয়সার জন্যে তুমি যেন একেবারে মরে গেলে ! আর দ্যাখো, ওই যে তখন সেই ছোড়াটাকে আর ছুড়িটাকে

পাঠালাম পান্নালালের কাছে, থাকবার জায়গা যদি ওরা না পায় তো তোমার ওই নীচের ঘরটা ছেড়ে দিতে হবে। লোকে একখানা পায় না আর দু'দুখানা ঘর আগ্‌লে বসে আছ তুমি!

বিশু বললে, একখানা ঘরে আমার দোকানের জিনিষপত্র আছে, আর এই একখানা ঘরেই তো আমি থাকি!

ওই জিনিষপত্তরের সঙ্গেই তুমি থাকবে। একা মানুষ তো!

বিশু বললে, তাহলে আমার যে কষ্টের সীমা থাকবে না বাবু।

ফণীবাবু বললেন, নিজের কষ্টটাই'চিরদিন দেখলে বিশু, একবার পরের কষ্টটা ছাখো।

—কার কষ্ট, কার আবার কষ্ট হলো? বলতে বলতে এসে দাঁড়ালো প্রকাশবাবু। পরেশের দাদা প্রকাশ চাটুজ্যে। বেঁটেখাটো ছোট মানুষটি। মুখে একমুখ দাড়িগোঁফ, হাতে একটি লাঠি। বললেন, কার কষ্টের কথা বলছো ফণী?

ফণীবাবু বললেন, সবাইকার কষ্ট, দেশদুনিয়ার। স্বাধীনতা পাবার পর থেকে দেখছি দেশের লোক আরও বেশী কষ্ট পাচ্ছে। আচ্ছা, বলতে পার প্রকাশ, এ—কষ্টের কি শেষ হবে না?

প্রকাশ বললেন, হবে। নিশ্চয়ই হবে। পৃথিবীতে কোন কিছুই চিরস্থায়ী নয় ভাই। প্রকাশের মুখে প্রত্যয়ের দৃঢ়তা।

ফণীবাবু বললেন, কিছুই চিরস্থায়ী নয় ও-কথা সবাই জানে।

প্রকাশবাবু বললেন, না জানে না। এই তো দেখছি তুমিই জানো না, জানলে জিজ্ঞাসা করতে না।

ফণীবাবু কথাটাকে উড়িয়ে দিলেন।—আরে দূর দূর, একথা আমাদের দেশের ছোট ছেলেটি পর্যন্ত জানে। ছেলেরাও বলে এ্যায়সা দিন নেহি রহেগা।

প্রকাশবাবু বললেন, জানে, কিন্তু বিশ্বাস করে কই? সবাই জানে ভগবান আছেন, কিন্তু বিশ্বাস করে না। আজ একটু তাড়াতাড়ি আছে ফণী, আজ চলি। রবিবার দিন কথা হবে।—

এ্যায়সা দিন নেহি রহেগা, এ্যায়সা দিন নেহি রহেগা! বলতে বলতে তিনি চলে গেলেন।

ফণীবাবু সেইদিকে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ, তারপর মুখ ফিরিয়ে বললেন, দেখো বিশু, আমাদের এই গলির ভিতর এই একটি মানুষ আছে—ভারি সুন্দর। দুঃখটাকে গায়েই মাখে না।

বিশু বললে, ওর আবার দুঃখু কিসের? ওরা দুটি ভাই আর ওর স্ত্রী। এই তিনটি মানুষের সংসার। নিজে চাকরি করে। ছেলেপুলে নেই। ওর কোন ঝঞ্ঝাটও নেই।

ফণীবাবু বললেন, কার যে কোথায় দুঃখ তা তুমি কেমন করে জানবে বিশু? দুঃখতো মানুষের গায়ে লেখা থাকে না। অথচ দুঃখ ছাড়া মানুষ নেই। তবে ওর দুঃখ ভগবান দূর করে দেবেন। যাক্‌গে তুমি ও-সব বুঝবে না। পান্নালালের ওখানে ঘর ওরা পেলে কিনা দেখবো নাকি?

এই বলে তিনি উঠতে যাচ্ছিলেন। বিশুই তাকে উঠতে দিলে না। বললে, বসুন, বসুন। ঘর ওরা নিশ্চয়ই পেয়েছে। না পেলে এতক্ষণ ফিরে আসত।

বিশু ঠিকই বলেছে। ঘর ওরা সত্যিই পেয়েছে।

পান্নালাল এক অদ্ভুত মানুষ। ভাড়াটে পেলে সে ছাড়বে না কিছুতেই। ঘর তার থাক আর নাই থাক।

থাকবার মধ্যে আছে তার এই দোতালা বাড়ীখানি, আর আছে একটি সুন্দরী স্ত্রী। বাড়ীর প্রত্যেকটি ঘর উঠোন, বারান্দা এমন কি সিঁড়ির নীচেটা পর্য্যন্ত ভাড়া দিয়ে নিজে সে উঠে এসেছে ছাতে। টিন আর বাঁশের দরমা দিয়ে থাকবার মত ঘর সে তৈরী করে নিয়েছে। তারই সুমুখে ফাঁকা যে ছাতটা পড়ে আছে তার উপর খড়ি দিয়ে ঘর কেটে কেটে পান্নালাল বললে, এইটি আপনাদের শোবার আর এইটি রান্নার জায়গা। হলো তো?

রিণি আর বিনয় হাঁ করে দাঁড়িয়েছিল ছাতের কিনারায় বিনয় ভাবলে, লোকটা পাগল না কি ?

বললে, কিছু বুঝতে পারছি না মশাই, আমরা চললাম।

চলেই আসছিল তারা। পান্নালাল আটকালে। বললে, এত করে বুঝিয়ে দিলাম তবু বুঝতে পারলে না ?

নিজের ঘর দুখানা দেখিয়ে দিয়ে বললে, অমনি ঘর আমি তৈরী করে দেবো। দরমা, টিন, কাঠ, দোর, জানালা—মজুত। কতক্ষণ লাগবে ঘর তুলতে ?

বিনয় বললে, যতক্ষণ লাগবে ততক্ষণ আমরা থাকবো কোথায় ?

পান্নালাল বললে, ততক্ষণ আমার গেষ্ট। আমার বাড়ীতে থাকবে। বলেই সে হাঁকলে, কালী করালী !

হাঁকবা মাত্র দরমার ঘরের ভেতর থেকে একটি মেয়ের মুখ বেরিয়ে এলো। মুখখানি সুন্দর, কিন্তু রং কালো। বললে, আ-মর মুখপোড়া, বুড়ো বয়সে রসিকতা হচ্ছে! বাইরের লোক রয়েছে না দাঁড়িয়ে !

পান্নালাল বললে, লোক আবার কোথায় ? ওরা তো আমার গেষ্ট, অতিথি। যতক্ষণ না ঘর তৈরী হচ্ছে ততক্ষণ ওরা থাকবে তোমার কাছে।

এই বলে রিণির দিকে তাকিয়ে পান্নালাল বললে, যাও না গো ওইখানে, আমার গিন্নীর সঙ্গে ভাব-সাব কর। ভয় কি ?

বিনয় বললে, শুনুন তাহলে। ছাতে ঘর তো না হয় তুলে দেবেন বলছেন, ভাড়া কত দিতে হবে ?

পান্নালাল অম্লানবদনে বললে, তিরিশ টাকা। নো সেলামী নো এ্যাড্ভান্স। তবে হ্যাঁ, ঘর তোলবার খরচ আছে। টাকাটা আগেই দিতে হবে।

বিনয় বললে, ভাড়াটা একটু বেশি হলো না ?

পান্নালাল এক কথায় কমিয়ে দিলে। বললে, আচ্ছা যাও

পঁচিশ। আর কথা বোলো না। আমি যাচ্ছি মজুর ডাকতে। পান্নালাল সত্যিই চলে গেল। এদিকে রিণি তখন সেই মেয়েটির কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

বিনয় ডাকলে, রিণি!

রিণি বললে, যাচ্ছি।

পান্নালালের বৌ জিজ্ঞাসা করলে, কে হয়?

রিণি বললে, দাদা।

—কেমন দাদা? গ্রাম সম্পর্কে?

—না না আপন দাদা। সহোদর ভাই বোন আমরা।

রিণি বিনয়ের কাছে এসে হেসে বললে, বুঝেছি কেন ডাকছো।

বলেই সে করালীর দিকে পেছন ফিরে হাতত্নটো কাপড়ের তলায় ঢুকিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, ছুটোই দেবো?

—না, এখন একটা দে।

একটি হাত খালি করে হাতের একটি বালা বিনয়ের হাতে দিয়ে রিণি বললে, তোমার কাছে কিছু পয়সা তো আছে। আগে দোকানে গিয়ে চা খাওগে যাও। সকালে চা না খেলে তোমার আবার মাথা ধরে।

বিনয় বললে, আমি না হয় খেয়ে নিচ্ছি, কিন্তু তোর জন্যে ভাঁড়ে করে আনতে আনতে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

কথাটা করালী বোধহয় শুনতে পেয়েছিল। বললে, দোকান থেকে আনতে হবে না। চা হচ্ছে। দাদাকে যেতে বারণ করুন। চা খেয়ে যাবেন।

ছু'জনেই ফিরে এলো।

দরমার ঘর। কিন্তু বেশ সুন্দর দেখতে। সুমুখে একটা চৌকি পাতা ছিল। বিনয় তার ওপর চেপে বসলো। বললে, আপনাদের খুব কষ্ট দিলাম।

করালী বললে, কষ্টের এখনও অনেক বাকি। উনি যাই বলুন, ওর একদিনে হবে না। তিন চার দিন লাগবে।

রিণি বলে উঠলো, তিন চার দিন! ততদিন আমরা এইখানেই খাবো, থাকবো?

করালী বললে, ভালই তো! কাল আপনি রাঁধবেন। আমার ছুটি।

রিণি বললে, আমাকে 'আপনি' বলবেন না।

করালী বললে, এক-আধবার বলতে হয়। নতুন পরিচয় যে তাই বলে কি রোজই বলবো নাকি?

গরম জলে চা আগেই দেওয়া হয়েছিল। চামচ দিয়ে জলটা একবার দেখলে করালী।

রিণি বললে, আমরা আসায় আপনার খুব অসুবিধে হলো।

করালী কাপে চায়ের জল ঢালতে ঢালতে বললে, ও, তুমি বুঝি 'আপনি' বলবে, আর আমি বলবো 'তুমি'? তা হবে না। বলেই সে প্রথম কাপটি বিনয়ের দিকে বাড়িয়ে ধরলে।

বিনয় কাপে চুমুক দিয়ে বললে, বাঃ চমৎকার! বেশ চা হয়েছে।

করালী হেসে তার মুখের দিকে তাকালে। বললে, প্রথম দিনে এত খোসামুদি ভাল নয়।

রিণি হো হো করে হেসে উঠলো।

ফণীবাবু তখনও বসেছিলেন বাড়ীর সুমুখে, একজন টেলিগ্রাফ পিওন এসে দাঁড়ালো সাইকেল নিয়ে।—তিন নম্বর বাড়ী কোন্‌টা হবে?

ফণীবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, টেলিগ্রাম?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, প্রকাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

—প্রকাশ তো আপিসে চলে গেল। ওর ভাইটাও গে
বাজারে। টেলিগ্রাম নেবে কে? বাড়ীতে প্রকাশের স্ত্রী আছেন
ওই যে ওই বাড়ী। ওই যে আলোটা দেখছো—ওরই পাশের বাড়ী

বাইকে চড়ে পিওন চলে গেল সেইদিকে।

ফণীবাবু তখনও থামেননি···আমাদের টেলিগ্রামে তো ভাে
খবর প্রায়ই থাকে না। দ্যাখো আবার প্রকাশের কি হ'লো!

হঠাৎ তিনি দেখতে পেলেন পরেশ আসছে বাজারের থে
হাতে নিয়ে বললেন, তোর দাদার নামে একটা টেলিগ্রাম এসেছে
ওই দ্যাখ্ দোরে পিওন দাঁড়িয়ে।

পরেশ তাড়াতাড়ি গিয়ে হাতের থলেটা নামিয়ে টেলিগ্রামট
নিলে। রসিদে সই করে পিওনকে ছেড়ে দিয়েই খামটা ছিঁে
নিজেই পড়ছিল টেলিগ্রামটা, ফণীবাবু হাঁক দিলেন, পরেশ
কিসের টেলিগ্রাম রে?

পরেশ বললে, বৌদির দিদির অসুখ। যেতে লিখেছে।

ফণীবাবু বললেন, তার মানে? প্রকাশবাবুর স্ত্রীর দিদি?

পরেশ বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ।

—কি করবি? তোর দাদাতো আপিসে চলে গেল।

—দেখি। বৌদিকে জিজ্ঞাসা করি।

পরেশ দোরের কড়া নাড়তেই ভেতর থেকে খিল খোলার
আওয়াজ পাওয়া গেল। দোর খুললে তার বৌদ—মলিনা।
ভেতর থেকে অসুখের কথাটা সে শুনতে পেয়েছিল বোধহয়।
জিজ্ঞাসা করলে, কার অসুখ ঠাকুরপো?

—চল বলছি।

দু'জনেই ভেতরে চলে গেল।

দেখা গেল, প্রকাশের বাড়ীর দোরের পাশ দিয়ে বিনয় আসছে।
দূর থেকে হাত-দুটি কপালে ঠেকিয়ে ফণীবাবুর উদ্দেশে একটি
প্রণাম করে বললে, নমস্কার!

—নমস্কার না হয় নিলাম একটা। জায়গা পেয়েছ তো ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, জায়গা মানে আশ্রয় একটু পেয়েছি আপনার মাশীর্বাদে। তবে বাড়ী এখনও পাইনি।

ফণীবাবু বললেন, পাবে, পাবে, পান্নালাল গেল মিস্ত্রী ডাকতে।

বিনয় ফণীবাবুর খুব কাছে এসে দাঁড়ালো। বললে, দেখুন, এখানে স্যাক্‌রার দোকান কোথায় বলতে পারেন ?

ফণীবাবু বললেন, খুব বলতে পারি। কিন্তু কলকাতা শহর, তুমি নতুন মানুষ—দেখি কি জিনিস ?

বিনয় বললে, মানে ?

—মানে অত্যন্ত সোজা। এর জন্যে আর অভিধান খুলতে য় না। স্যাক্‌রার দোকান খুঁজছো গয়না গড়াবার জন্যে নয় তা ঝতে পেরেছি। আমাদের মা-লক্ষ্মী থাকেন গৃহলক্ষ্মীদের অঙ্গে। দখি—মেয়েটির গা থেকে কি টেনে খুলে আনলে দেখি।

বিনয় গহনাটি ফণীবাবুর হাতে দিয়ে বললে, বালা একটা।

ফণীবাবু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলেন বালাটি। বললেন, কত চাই ?

যত বেশি পাই ততই ভাল।

ফণীবাবু উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, একটু দাঁড়াও, আমি আসছি।

বিনয় জিজ্ঞাসা করলে, আপনি কি এই কারবার করেন নাকি ?

ফণীবাবু বললেন, ইচ্ছে তো আছে, কিন্তু হয় কই ? কারবার রতে হলে খাঁটি সোনার কারবারই করা উচিত। না কি বল ?

এই বলেই ফণীবাবু পেছন ফিরলেন।

বিনয় বললে, সোনাটা কি রকম, কত ওজন, কিছুই যে দখলেন না ?

ফণীবাবু যেতে যেতে বলে গেলেন, তোমার বোন পেতলের য়না পরে না তা জানি।

আবার সেই চরণ-উকিল! আবার সেই এক কথা!

—ক'টা বাজলো বিশু?

থলে হাতে নিয়ে বাজার থেকে ফিরছে উকিলবাবু!

বিশু বললে, ঘড়ি না কিনলে বলবো না।

চরণ জবাব দিলে, তোমার কাছ থেকে ঘড়ি কেন কিনবো হে?

বিশু বললে, সস্তা হবে। সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড্।

চরণ-উকিল একটু এগিয়ে এলো। বিনয়ের দিকে তাকিয়ে বললে, আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় নেই মশাই, কিছু মনে করবেন না। দ্যাখো বিশু, আমি উকিল, ছোট আদালতে ওকালতি করে খাই, একটা কথা বলছি, বেশ মন দিয়ে শোনো। সেকেণ্ড্-হ্যাণ্ড্ ঘড়ি কিনতে বলছো কিনা, তাই বলছি। ঘড়ি, ঘোড়া আর বৌ এই তিনটি জিনিস সেকেণ্ড হ্যাণ্ড কখনও কিনবে না। কিনেছো কি ঠকেছো। মনে থাকে যেন।

এই বলে খুব একটা রসিকতা করলাম ভেবে হাসতে হাসতে যেই সে চলে গেল, ফণীবাবু বেরিয়ে এলেন বাড়ীর ভেতর থেকে। চুপি চুপি বিনয়ের হাতে একশ' টাকার একখানি নোট ধরিয়ে দিয়ে বললেন, এই একশ' টাকা দিলাম, নিয়ে যাও। এই টাকা ফুরোবার আগে একটি কাজকর্ম দেখে নিও। লেখাপড়া কিরকম শিখেছো বাবা?

বিনয় বললে, আমি এম-এ পাশ করেছি, আর রিণি আই-এ পাশ করেছে।

ফণীবাবু খুশী হলেন। বললেন, খুব ভাল। যাও।

গলির বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছিল বিনয়। ফণীবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, ওদিকে কোথায় যাচ্ছ?

বিনয় বললে, পান্নালালবাবুর বাড়ীতেই আমাদের খেতে হবে যখন, কিছু বাজার করে নিয়ে আসি।

—ভাল, ভাল, খুব ভাল।

ফণীবাবু তার উলটো দিকে যাচ্ছিলেন। পেছন থেকে বিশুর ডাক শুনে থম্‌কে থামলেন। আমাকে ডাকছো ?

বিশু বললে, হ্যাঁ দাদা।

বলেই তার গলার আওয়াজ একটু খাটো করে জিজ্ঞাসা করলে, জিনিসটার ওজন কত হবে আন্দাজ ?

—তা দু'ভরি আড়াই ভরি হবে।

বিশু বললে, একশ' টাকা, তার ওপর সুদ, ও আর ছাড়াতে হবে না বাছাধনকে।

ফণীবাবু বললেন, হুঁ। ছাড়াতে পারবে বলে মনে হয় না।

বিশু বেশ উল্লসিত হয়ে চোখ মুখের সে-এক অদ্ভুত ভঙ্গী করে হাত নেড়ে বললে, দিন মেরে !

ফণীবাবু বললেন, ঠিক বলেছ। ঘড়ির পার্টস মেরে আর কি হবে ? মারতে হলে সোনাদানাই মারতে হয়। না কি বল ?

বিশু বললে, এমনি এক-আঁধটা দাঁও পেলে আমাকেও দেবেন দাদা।

ফণীবাবু বললেন, নিশ্চয়ই দেবো। ভাল কাজ নিজে করতে না পারি, তোমার মত লোককে সাহায্য করলেও তো কিছু পুণ্য হবে।

এই বলে তিনি আর দাঁড়ালেন না, চলে গেলেন। প্রকাশের দোরটা যেই পেরিয়েছেন, ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো পরেশ।

—ফণীদা।

ফণীবাবুকে আবার দাঁড়াতে হলো।

পরেশ বললে, রেলের টাইম-টেবল্‌ আছে আপনার কাছে ?

—আমি কি ডেলি-প্যাসেঞ্জার যে আমার কাছে টাইম টেবল্‌ থাকবে ? তোর বৌদি বুঝি যাবার জন্যে তৈরি ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

ফণীবাবু বললেন, নিয়ে তো যেতে হবে তোকেই।

—তা ছাড়া আর কে আছে যে যাবে?

পরেশ চলে যাচ্ছিল, ফণীবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, কোথায় যাচ্ছিস?

—দাদার আপিসে টেলিফোন করতে। আর—

বলেই তার হাতের মুঠো খুলে সোনার একটি আংটি দেখিয়ে পরেশ বললে, পাঁচু স্যাক্‌রার দোকান থেকে—

ফণীবাবু বললেন, থাক্ আর বলতে হবে না। তোর বৌদি যদি জানতে পারে আমি শুনেছি, লজ্জায় ওঁর মাথা কাটা যাবে।

বাড়ীর ভেতর থেকে বৌদির ডাক শোনা গেল, ঠাকুরপো!

পরেশ চমকে উঠলো—এই রে! শুনতে পেয়েছে বোধহয়।

ফণীবাবু বললেন, তা শুনেই যখন ফেলেছে, আমার কাছে আসিস, আমি টাকা দেবো।

—তুমি টাকা দেবে?

ফণীবাবু বললেন, হ্যাঁ। আমি আজকাল ওই কারবারই করছি।

বৌদি কি বলছে শোনবার জন্যে পরেশ বাড়ীর ভেতর ঢুকে গেল।—কি বলছো বৌদি?

মলিনা বললে, তোমার দাদাকে এখন আর টেলিফোন কোরো না।

—কেন?

—আজ পূর্ণিমা। তোমার দাদা শুধু চা খেয়ে আপিস চলে গেছে। ওকে না খাইয়ে বাড়ী থেকে আমি বেরুতে পারব না।

পরেশ বললে, তবে যে এক্ষুনি বলছিলে তাড়াতাড়ি না গেলে দিদিকে হয়ত দেখতে পাব না।

মলিনা বললে, তা সে কপালে আমার যা আছে তাই হবে।

পরেশ বললে, দিদিই-বা কে, মা-ই বা কে। স্বামীর ওপর কেউ নেই বাবা। এই বলে তার হাতের আংটিটা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলে, এটার কি হবে?

মলিনা বললে, ওর ব্যবস্থা করতেই হবে। তোমার দাদার কাছে যা আছে আমি জানি।

ওদিকে পান্নালালের বাড়ীর সিঁড়ি দিয়ে ফণীবাবু উঠে গেলেন একেবারে তার ছাতে।

উঠেই বললেন, কই রে, সেই ভাই-বোনের বোনটা কোথায়?

করালীর কাছে বসে রিণি গল্প করছিল, মুখ বারিয়ে ফণীবাবুকে দেখেই চট করে বেরিয়ে এলো খোলা ছাতে।—আমাকে ডাকছেন?

—হ্যাঁ মা, তোমাকেই ডাকছি।

সোনার বালাটি চুপিচুপি তার হাতে দিয়ে বললেন, এটা রেখে দে।

রিণি অবাক হয়ে গেল বালাটা দেখে। বললে, এটা আপনার হাতে গেল কেমন করে?

ফণীবাবু বললেন, ওসব জঞ্জাল আমার কাছেই যায়। আমি এই সবের কারবার করি।

রিণি জিজ্ঞাসা করলে, দাদাকে টাকা দিয়েছেন?

—দিয়েছি।

রিণি ভাবলে বুঝি দাদা বেশি টাকা নিয়েছে। একটা বালায় হবে না, আর-একটা চাই। তাই সে বললে, আমি তখনই বলেছিলাম দুটোই দিই। দাদা নিলে না। এটাও দিই তাহ'লে?

ফণীবাবু বললেন, হ্যাঁ, তা দিবি বই-কি! সেই জন্যেই তো এসেছি!

রিণি সত্যি-সত্যিই আর-একটা বালা খুলতে যাচ্ছিল।

ফণীবাবু বললেন, ওরে না না খুলিসনি, খুলিসনি। মেয়েদের খালি হাত আমি দেখতে পারি না। তাই ওটা তোকে আমি দিতে এলাম মা। পর। টাকা যা দিয়েছি, দিয়েছি। ও আর কদ্দিন! ফুরিয়ে যাবার আগে তোর দাদাকে একটা কাজকর্ম জোগাড় করে নিতে বলিস। আমি চললুম।

—শুনুন!

ফণীবাবু ফিরে দাঁড়াতেই রিণি হেঁট হয়ে তাঁকে একটি প্রণাম করলে।

ফণীবাবু হেসে বললেন, এই বুঝি আমার পুরস্কার? রান্না করতে পারিস?

—হ্যাঁ!

—গান গাইতে?

—হ্যাঁ।

ফণীবাবু বললেন, তবে আর কি! ঘর-দোর হোক, তারপর একদিন এসে খুব পেট ভরে খাবো, আর আনন্দ করে তোর গান শুনবো। আজ চলি। যেতে যেতে সিঁড়ির মুখে আবার ফিরে দাঁড়ালেন তিনি। বললেন, আর একটা কথা। শোন্। এই যে এইটি তোকে ফিরিয়ে দিয়ে গেলাম এই কথাটা তোর দাদাকে না বলিস তো খুব ভাল হয়।

রিণি বললে, না। এত বড় কথা আমি চেপে রাখতে পারব না।

—এইটে বড় কথা হ'লো? দূর বোকা মেয়ে!

হাসতে হাসতে ফণীবাবু নীচে নেমে গেলেন।

পরেশকে সঙ্গে নিয়ে তার বৌদিদি মলিনা চলে গেছে তার দিদিকে দেখতে। প্রকাশ একাই আছেন বাড়ীতে। সকালে

উঠে মুখ হাত ধুয়ে স্নান করে তিনি বেরিয়ে যান বাড়ী থেকে। হোটেলে খেয়ে আপিসে যান। আবার আপিসের কাজ সেরে এদিক-ওদিক ঘুরে-ফিরে একেবারে রাত্রের খাবার খেয়েই বাড়ীতে ফিরে আসেন। সদর দরজায় তালা বন্ধ থাকে সারা দিন।

শান্ত নির্বিরোধী মানুষ এই প্রকাশ। নিশ্চিন্ত নির্বিকার। কিন্তু তাঁরও জীবনে এলো বিপর্যয়। আপিসে মাত্র দু'শ টাকা মাইনের একটি চাকরি। মাসের প্রথমে মাইনেটি পেয়েই তিনি তাঁর স্ত্রীর হাতে এনে দেন। নিজের যৎসামান্য প্রয়োজন যখন হয় স্ত্রীর কাছে হাত পাতেন। প্রকাশ সেদিন আপিসে কাজ করছেন। আপিসের বড়বাবু এসে দাঁড়ালেন তাঁর কাছে। এসেই বললেন, আপনাকে দিয়ে আর চলবে না দেখছি।

প্রকাশ মুখ তুলে বললেন, কেন?

—কিছুই আপনার মনে থাকে না। গত মাসে বলেছিলাম সুইপারের মাইনে থেকে একটা টাকা কেটে নেবেন। নিয়েছেন?

প্রকাশ বললে, আজ্ঞে না।

বলেই তিনি আবার কাজ করতে লাগলেন। ভাবলেন, এটা আবার কথা নাকি? আপিসের ছুটির পর প্রতিদিন ঝাঁটা দিয়ে ঘর-দোর পরিষ্কার করে ঝাড়ুদার। মাসের শেষে মাইনে পায় তিনটি টাকা। একদিন নাকি তার ছেলেটার হয়েছিল অসুখ, বেচারা ডাক্তারখানায় গিয়েছিল ছেলেটাকে দেখাতে। এখানে আসতে পারেনি। তার জরিমানা একটি টাকা কেটে রাখতে বলা হয়েছিল। ঝাড়ুদারের মুখে তার না-আসার কারণটা শুনে প্রকাশ তার মাইনে থেকে একটি টাকা কেটে রাখতে পারেননি। এই তাঁর অপরাধ।

বড়বাবু কিন্তু তখনও দাঁড়িয়ে রইলেন সেইখানে। বললেন, কথাটা গ্রাহ্যই করলেন না আপনি?

প্রকাশ বললেন, একটা টাকা আমার মাইনে থেকে কেটে নেবেন।

বড়বাবু 'হুঁ' বলে রেগে চলে গেলেন সেখান থেকে।

প্রকাশের মনটা কিন্তু খারাপ হয়ে গেল। এই বড়বাবু মানুষটি তাঁর ওপর প্রসন্ন নন।

প্রকাশ বাড়ী ফিরে এলেন সন্ধ্যার কিছু পরেই। চিঠির বাক্সে পেলেন একখানা চিঠি।

চিঠি লিখেছে তাঁর স্ত্রী। তার দিদি মারা গেছে। বাড়ীতে তার একটা কানা ছেলে আর তার বাবা। ছেলেটা ধরে বসেছে সে যাবে তার সঙ্গে কলকাতায়। তাই মলিনা তাঁর অনুমতি চেয়েছে।

সব শেষে লিখেছে, কিছু টাকা পাঠিয়ে দিও। অন্ততঃ পঁচিশটা টাকা। মাইনে যদি এখনও না পেয়ে থাকো, আমার সেলাইয়ের কলটা খুলো। ডালাটা তুলে দেখবে যেখানে ছুঁচ আর সুতো থাকে, সেইটের ভেতর আমার একটা ভাঙ্গা মাকড়ি আছে। সেই সোনাটুকু দেখেশুনে বিক্রি করলে পঁচিশ-তিরিশটা টাকা নিশ্চয়ই পাবে। সেই টাকা মণিঅর্ডার করে তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দিও। এখানে কয়েকটা টাকা দিয়ে আমরা চলে যাব কলকাতায়।

চিঠি পেয়ে চিন্তিত হয়ে উঠলো প্রকাশ। ভাবলে, সামান্য ওই সোনাটুকু বিক্রি না করে আপিস থেকে টাকাটা অগ্রিম নিলেই চলবে।

পরের দিন আপিসে গিয়ে প্রকাশ অগ্রিম পঞ্চাশটা টাকা চাইলে ক্যাসিয়ারের কাছে। বললে, মাইনে থেকে কেটে নিও।

ক্যাসিয়ার বললে, আপনি বসুন গিয়ে। আমি আসছি বড়বাবুর কাছ থেকে।

কথাটা শুনে বড়বাবু চেঁচিয়ে উঠলেন। ক্যাসিয়ার তো বলেই অপ্রস্তুত!

প্রকাশ এতদিনের পুরনো কর্মচারী। সবাই তাকে ভালবাসে। চট্ করে বড়বাবুর কথাটা প্রকাশকে জানাতে পারলে না ক্যাসিয়ার। বললে, টাকাটা আপনি আজ পাবেন না প্রকাশবাবু। কাল-পরশুর ভেতর আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

ক্যাসিয়ার ভাবলে, যেমন করে হোক, এদিক-ওদিক করে টাকাটা তাঁকে সে দেবে।

প্রকাশ নিশ্চিন্ত হ'লো।

তারপর সে বেমালুম ভুলে গেল কথাটা।

ওদিকে ক্যাসিয়ারও তার নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত। দু'তিনটে দিন যখন নির্বিঘ্নে পেরিয়ে গেল তখন ভাবল বুঝি প্রকাশবাবু নিশ্চয়ই অন্য কোথাও জোগাড় করেছেন। প্রয়োজন থাকলে তিনি আবার আসতেন।

দুটো দিন পেরিয়ে যাবার পর সেদিন বোধহয় রবিবার। প্রকাশের শরীরটা কেমন যেন ম্যাজম্যাজ করছিল। হোমিওপ্যাথি ওষুধের ছোট একটি বাক্স আছে তার। এই রকম কিছু হলেই চট্ করে একটা ওষুধ খেয়ে নেয়। সেদিন ওষুধ খেতে গিয়ে মনে হলো—শুধু কাশি নয়, মাথাটাও যেন একটু ধরেছে। মেটেরিয়া মেডিকাটা একবার ভাল করে দেখে নেওয়া ভাল। কোথায় রেখেছে বইখানা খুঁজেও পাচ্ছে না ছাই।

খুঁজতে খুঁজতে পেলে শেষ পর্যন্ত। সেলাইএর কলটার কাছে নামিয়ে রেখেছিল কখন। তুলে রাখতে ভুলে গেছে। প্রকাশ বইটা নিয়ে তার টিনের চেয়ারটির ওপর ভাল করে চেপে বসলো। কিন্তু মুস্কিলে পড়ে গেল বইএর পাতা ওলটাতে গিয়ে। ব্রাইওনিয়ার পাতার ওপরেই বেরিয়ে পড়লো তার স্ত্রীর সেই পোষ্টকার্ডের চিঠিখানি। মনে পড়লো টাকার কথা। টাকা এখনও পাঠানো হয়নি। ক্যাসিয়ার-বেচারা তার কাজ নিয়েই ব্যস্ত। টাকা দিতে সে ভুলে গেছে নিশ্চয়ই।

কাল সোমবার। প্রকাশ ভাবলে, আপিসে গিয়ে তার প্রথম কাজ হবে মলিনাকে টাকা পাঠানো। মণিঅর্ডারের ফর্ম আপিসেই পাওয়া যাবে। দেরি হয়ে গেছে। টেলিগ্রাম মণিঅর্ডারে পাঠাতে হবে। কিন্তু ক্যাসিয়ার যদি টাকা না দিতে পারে?

নিজেও তৈরী হয়ে যাওয়া ভালো। প্রকাশ উঠলো মলিনার ভাঙ্গা মাক্‌ড়িটির খোঁজে। চিঠিখানি আর একবার ভাল করে পড়লে। তারপর যেখানে সূতো ছুঁচ-টুচ থাকে সেই খুপরির খোঁজে সারা দুপুরটা ঘরের জিনিসপত্র সব তছনছ করে ফেললে সে। ভাঙ্গা মাক্‌ড়ি কোথাও পেলে না।

বেলা তখন দুটো। আজ তার খাওয়াও হলো না। না হোক্‌ শরীরটাও ভাল ছিল না।

কিন্তু ভাঙ্গা মাকড়িটা কোথায় গেল?

প্রকাশ আর একবার চিঠিখানা পড়বার জন্যে বসলো। যাঃ, চিঠিখানা গেল কোথায়? বইএর ভেতর নেই, টেবিলে নেই, চেয়ারে নেই। শেষে পাওয়া গেল চিঠিখানি। মনের ভুলে নামিয়ে রেখেছিল সেলাইএর কলটার পাশে।

প্রকাশ সেইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পড়লে চিঠিখানা। নিজের বোকামির জন্য নিজেই হেসে ফেললে। ছি ছি, এই তো স্পষ্ট লেখা রয়েছে, সেলাইএর কলটা খুলো—সেলাইএর কল খুলে, তার ঢাকাটা তুলতেই খুপ্‌রিও পাওয়া গেল, মাক্‌ড়িও পাওয়া গেল।

প্রকাশের সারা গা তখন ঘামে ভিজে গেছে।

যাক্‌, ওযুধটা আর খেতে হলো না।

পরের দিন আপিসে গিয়েই প্রকাশ মণিঅর্ডারের ফর্মখানা আগে লিখে ফেললে। তারপর লাল কালিতে আড়াআড়ি ভাবে 'By Telegram.'

নিজের পকেটটা একবার টিপে টিপে দেখে নিলে, ভাঙ্গা

মাক্‌ড়িটা কাগজে মুড়ে ঠিক এনেছে সঙ্গে। ভেবেছিল আসবার পথে স্যাক্‌রার দোকানে সেটা বেচে আসবে। কিন্তু তা' আর হয়ে ওঠেনি। যে হোটেলে রোজ খায়, সেখানে যাবার পথে একটাও স্যাক্‌রার দোকান তার নজরে পড়লো না। তারপর খেয়ে দেয়ে ট্রামে চড়ে স্যাক্‌রার দোকানের কথা মনে পড়লো একেবারে আপিসের দরজায় এসে।

সাত-আট দিন হয়ে গেল। ক্যাসিয়ারের কাছে নিশ্চয়ই টাকা পাওয়া যাবে।

প্রকাশ উঠতে যাবে, এমন সময় হাতের কাছে একটা ফাইল নামিয়ে দিলে চণ্ডী বেয়ারা। মণিঅর্ডারের ফর্মটা ড্রয়ারের ভেতর রেখে সে কাজে বসলো। বললে, বাবা চণ্ডী, তুমি একবার চট্‌ করে পোষ্টাপিসে গিয়ে আমার একটা কাজ করে দিয়ে আসবে বাবা ?

চণ্ডী জিজ্ঞাসা করলে, কি কাজ ?

প্রকাশ বললে, একটি মণিঅর্ডার। দেরি হবে না, টেলিগ্রাফ্‌ মণিঅর্ডার।

চণ্ডী বললে, দেবেন।

কাজটা শেষ করে ফাইলটা ছেড়ে দিল প্রকাশ। তার পরেই ক্যাসিয়ারের কাছে যাবে যাবে করছে, এমন সময় বড়বাবুর খাস বেয়ারা সীতারাম এসে দাঁড়ালো প্রকাশের কাছে। বললে, আপনাকে সেলাম দিয়েছেন বড়বাবু।

বড়বাবুর ঘরে ডাক পড়েছে প্রকাশের। সুসংবাদ যে নয়, প্রকাশ তা বুঝতে পারলে। কারণ নিজের ঘরে ডেকে সুসংবাদ শোনাবার মত মানুষ তিনি ন'ন।

বড়বাবু বোধকরি প্রকাশের জন্যই অপেক্ষা করেছিলেন। প্রকাশ ঘরে ঢুকতেই বড়বাবু বললেন, হ্যারিসন সারোগীর চেকটা আপনি পাঠিয়ে দিয়েছেন ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

বড়বাবু ভেংচি কেটে বলে উঠলেন, আজ্ঞে হ্যাঁ। পাঠাতে বারণ করেছিলাম না ?

—হ্যাঁ তা করেছিলেন, কিন্তু দেখুন—

বলে প্রকাশ তার সুমুখের চেয়ারটাতে বসে বোধকরি বলতে যাচ্ছিল কেন পাঠিয়েছে, কিন্তু বসবার সুযোগ তার মিললো না। বড়বাবু বললেন, যাক্ আর বসতে হবে না। আমি বুঝতে পেরেছি।

—আজ্ঞে ?

বড়বাবু বললেন, কত টাকা খেয়েছেন—সারোগীর কাছ থেকে ?

প্রকাশ যেন আকাশ থেকে পড়লো। - টাকা ?

—হ্যাঁ হ্যাঁ টাকা। এই নিয়ে দারুণ একটা মামলা হবে। সারোগী আমাকে ছাড়বে না সহজে। চেক হাতে পেয়ে গেছে।

প্রকাশ বললে, একটা কথা বলবো ?

—কি কথা ?

চেকটা পাঠানো হয়েছে শনিবারে। আজ হয়ত পেয়েছে কি এখনও পায়নি। আমি তাদের আপিস থেকে চেয়ে নিয়ে আসবো ?

বড়বাবু বললেন, দেবে ! আপনার চেহারা দেখেই দিয়ে দেবে না দিলেই নয়। খুব হয়েছে আর সারোগীর আপিসে যেতে হবে না। আপনি আমাদের অপিস থেকে যান। আমাকে নিষ্কৃতি দিন।

প্রকাশ হেঁটমুখে দাঁড়িয়ে রইলো।

বড়বাবু সাদা একটা প্যাড নিয়ে খচ্ খচ্ করে কি সব লিখলেন। লিখে প্যাডটা প্রকাশের হাতের কাছে বাড়িয়ে ধরে বললেন, নিন, সই করুন।

—কি এটা ?

বড়বাবু বললেন, আপনার Resignation Letter.—জবাবের দরখাস্ত।

প্রকাশ বললে, আমার জবাব হয়ে গেল ? এই সামান্য অপরাধের—

কথাটা তাকে শেষ করতে দিলেন না বড়বাবু। বললেন, সামান্য নয়। কি কাণ্ড যে আপনি করেছেন বুঝতে পারছেন না। পরে বুঝবেন। আপনার মাথাটি একেবারে গেছে।

প্রকাশ বললে, একখানা চিঠি আমার স্ত্রীর কাছ থেকে—

—থাক্ থাক্। কোনও কথা আমি শুনতে চাই না, আপনি সই করুন।

কলমটা বাড়িয়ে দিলেন বড়বাবু। প্রকাশ সই করলে। বড়বাবু বললেন, এই স্লিপটা নিয়ে গিয়ে ক্যাসিয়ারকে দিন। তিনি আপনার মাইনে মিটিয়ে দেবেন।

এই বলে একটা স্লিপ লিখে বড়বাবু ঘণ্টা বাজালেন। সীতারাম সেলাম করে দাঁড়াতেই স্লিপটা তার হাতে দিয়ে বড়বাবু বললেন, ক্যাসিয়ারবাবুকে দাও গে। যান আপনি ওর সঙ্গে।

প্রকাশ বললে, আমার ভাই-এর বি-এ পরীক্ষার সময় কিছু টাকা আমার নেওয়া ছিল, সে-টাকাটা এখনও শোধ হয়নি।

বড়বাবু বললেন, সে হিসাব আছে ক্যাসিয়ারের কাছে। দেনাপাওনা সে ঠিক মিটিয়ে দেবে। আপনাকে আর একমাসের পুরো দিয়ে দিয়েছি। যান।

পাছে আবার কোনও বায়নাক্কা করে বসে তাই বড়বাবু চট্ করে সেদিনের খবরের কাগজটা তুলে নিয়ে লম্বা ক'রে মেলে ধরলেন নিজের মুখের ওপর।

ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে কাগজটা তিনি নামিয়ে রেখে একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন।

ছ' বছরের চাকরি এক কথাতেই খতম্!

প্রকাশ তার চেয়ারের কাছে এসে চাদরটি খুলে নিয়ে কাঁধে ফেললে, টেবিলের ওপরের কাগজপত্রগুলো গুছিয়ে রাখলে, তারপর ছাতিটি হাতে নিয়ে তার সহকর্মী নরেনের দিকে তাকিয়ে বললে, চাকরিটা গেল রে ভাই।

নরেন তার সুমুখের চেয়ারটির দিকে তাকালে।

—ওরে হাবু, যা বলেছিলাম, হলো কিনা ছাখ্।

হাবু বললে, কাজটা ভাল হলো না।

প্রকাশ বললে, ভাল কি মন্দ তিনিই জানেন। তোমরা ভাই একটু সাবধানে থেকো। ছ'টি বছর কাটিয়েছি এখানে। কত অন্যায় করেছি, কত অপরাধ করেছি ; কত কথা বলেছি, কিছু মনে কোরো না ভাই তোমরা।

নরেন চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। বললে, এ কি বলছেন প্রকাশদা? আমরাই বরং কত অপরাধ করেছি আপনার কাছে। এই বলে নরেন তার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলে। একে একে সবাই উঠে এলো। সবাই প্রণাম করলে। প্রকাশ একেবারে অভিভূত হয়ে গেল। ছাতাটা নামিয়ে দু'হাত বাড়িয়ে প্রত্যেককে জড়িয়ে ধরে বলতেলাগলো, ওরে না না প্রণাম করিসনি প্রণাম করিসনি। তোরা আমার কেউ নোস্, তোদের সকলের নামও আমি জানি না ছাই, তবু তোদের ছেড়ে যেতে আমার বুকের ভেতরটা—না না আমি আর এখানে দাঁড়াতে পারছি না। ভগবান তোদের মঙ্গল করুন।

গলাটা তার ধরে এলো। চোখের জল মুছতে মুছতে প্রকাশ বেরিয়ে যেতে যেতে আবার ফিরে এসে তার ড্রয়ারটা খুললে। মলিনার নামে লেখা টেলিগ্রাম মণিঅর্ডারের কুপনটি ফেলে যাচ্ছিল। সেইটে বের করে পকেটে রেখে প্রকাশ চলে গেল।

প্রকাশ তার বাড়ীর সামনে এসে দেখলে দোর খোলা। স্ত্রী ফিরে এসেছে।—এ কি তোমরা ফিরে এলে?

মলিনা বললে—তুমি কি ভেবেছিলে আমরা ওইখানেই থাকবো? চিঠির জবাবও দিলে না, টাকাও পাঠালে না—আচ্ছা ভুলো মন যা হোক।

—না না ভুলিনি। এই ছাখো।

প্রকাশ তার পকেট থেকে ভাঁজ-করা মণিঅর্ডারের কুপনটি বের করে দেখালো।

—ওটা এখন দেখে কি করবো? মলিনা হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করলে, ভাঙ্গা মাক্‌ড়িটা কোথায়? বেচেছো না কি?

প্রকাশ বললে, না, বেচা আর হলো কই?

এই বলে সে তার পকেট থেকে কাগজে মোড়া মাক্‌ড়িটি বের করে মলিনার হাতে দিলে।

মলিনা হাসতে লাগলো।—কি রকম মানুষ গো তুমি! এখনও তোমার মাক্‌ড়িটা বেচবার সময় হ'লো না আর মণিঅর্ডারের কাগজটি লিখে পকেটে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছো! তা বেশ করেছো, যাও হাত পা ধুয়ে বোসো, আমি চা করে দিচ্ছি।

জামাটা খুলতে গিয়ে প্রকাশের মনে পড়লো আড়াইশ' টাকার নোট রয়েছে তার পকেটে। আসল কথাটাই এখনও বলা হয়নি মলিনাকে, হাত পা ধোবার আগেই নোটগুলি হাতে নিয়ে প্রকাশ মলিনার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো।

—এই নাও আড়াইশ' টাকা রেখে দাও।

টাকা পেয়ে মলিনা খুশীই হলো। কিন্তু এখন তো আর মাইনে পাবার কথা নয়!—এ টাকা কোথায় পেলে?

প্রকাশ বললে, কাউকে বোলো না যেন। চুপি চুপি শোনো। চাকরিটা আজ আমার গেল।

—এ কি সর্বনেশে কথা গো! চাকরি গেল কি?

—হ্যাঁ গেল। ওই টাকা দিয়ে যতদিন চলে চালাও। এর মধ্যে চাকরি একটা ঠাকুর জুটিয়ে দেবেন নিশ্চয়ই। ভেবো না। ভাবলে শরীর খারাপ হয়। বলেই প্রকাশ স্নানের ঘরে গিয়ে ঢুকলো।

অনেকগুলো বেকার হয়ে গেল শিউলিতলা লেনে।

প্রকাশের চাকরি গেল। তার ছোট ভাই পরেশের তো

নিত্যকারের কাজ রয়েছে খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন দেখে দেখে ক্রমাগত দরখাস্ত করা। ওদিকে চাকরির সন্ধানে বিনয় আর রিণি তো সারা কলকাতা শহর চষে বেড়াচ্ছে দিনরাত। সেদিন অমনি বিনয় আর রিণি—দু'ভাই-বোনে সকাল সকাল খেয়ে দেয়ে বেরুচ্ছে, ওদিক থেকে সুন্দর আসছিল বাইরে থেকে। শিউলিতলার মুখেই দেখা। সুন্দর একেবারে তার উচ্ছ্বসিত আনন্দে ভেঙ্গে পড়ে তার নিজস্ব ইংরেজীর বাণ ডাকিয়ে দিলে। বিনয়ের দিকে হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো, হ্যালো, হ্যালো, হ্যালো গুড মর্ণিং! গুড্ মর্ণিং!

হ্যাণ্ডসেক্ করার অভ্যাস বিনয়ের নেই। সে তার হাতদুটি জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে বললে, নমস্কার।

সুন্দরও বাধ্য হ'লো নমস্কার করতে। নমস্কার করে বললে, আপনার সঙ্গে একদিন ভাল করে আলাপ করতে হবে। চেনেন তো আমাকে? সেদিন সেই—

বিনয় বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ, খুব চিনি।

সুন্দর বললে, ফণীবাবু আমার ফাদার।

কথাটা সে এমনভাবে ঘাড় উঁচু করে বললে, মনে হলো যেন সে সগর্বে জানাতে চায় ফণীবাবুর মত বড়লোককে ফাদার বলবার দুর্লভ সৌভাগ্য একমাত্র তারই।

বিনয় বললে, জানি। যাবেন একদিন আমাদের ওখানে, মানে পান্নালালবাবুর ছাতে।

সুন্দর যেন এই কথাই শুনতে চাচ্ছিল। বললে, ইয়েস্ ইয়েস্, ইয়েস্ থ্যাঙ্ক ইউ! নিশ্চয়ই যাব।

অনেকক্ষণ থেকে তাকাচ্ছিল সে রিণির দিকে। এইবার ফট্ করে বলে বসলো, এই বুঝি আপনার সিস্টার?

বিনয় পরিচয় করে দিলে—রিণি, ইনি ফণীবাবুর ছেলে।

রিণি তার হাতদুটি কপালে ঠেকিয়ে সবিনয়ে বললে, নমস্কার।

সুন্দর তৎক্ষণাৎ জবাব দিলে—নমস্কার। আপনি খুব ভাল গান গাইতে পারেন আমি শুনেছি।

কথাটার জবাব দিলে বিনয়। বললে, আজ্ঞে না, খুব ভাল নয়। তবে গান ও গাইতে পারে, আমিও পারি। কিন্তু এরই ভেতর ও-সব কথা আপনি জানলেন কেমন করে, কে বললে ?

সুন্দর হো হো করে হেসে উঠলো—কে বললে জিজ্ঞেস করছেন ? বলি আছেন কোথায় আপনারা ? আপনারা যার বাড়ীতে আছেন ওই পান্নালালই তো আমাদের এই শিউলিতলার গেজেট। He can keep no word in his belly. পেটে একটি কথা থাকে না—সব কথা সবাইকে বলে দেয়। আপনারা একটু কেয়ারফুলনেস্ হবেন। আর ওই যে singing dancing ব্যাপার, ওটা আমারও একটু আধটু আছে। তবে আমার সব ব্যাপারই একটু ডিফারেন্ট্লি আমার গানের কম্পোজিটার আমি নিজে। নিজেরই কম্পোজিটিং, নিজেরই টোনিং।

বিনয় জোর করে গম্ভীর হয়ে বললে, তাই নাকি ?

রিণি তার ইংরেজি শুনে অবাক। আর একটু হলেই হেসে ফেলতো সে। অতি কষ্টে দাঁতে দাঁত চেপে মুখ ফিরিয়ে নিলে।

সুন্দর বললে, আচ্ছা দাঁড়ান, আমি একদিন নিজে গিয়ে আমার রাইটিং গান আপনাদের শুনিয়ে আসবো।

বিনয় তাড়াতাড়ি তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য বললে, আসবেন। আজ চলি।

—কিন্তু এ কি করলে দাদা ? রিণি প্রমাদ গনলে। বললে, মিছি মিছি ওঁকে যেতে বলছো দাদা, আমাদের হারমোনিয়াম কোথায় ?

সুন্দর ছাড়বার ছেলে নয়।—হারমোনিয়াম আমি নিজে নিয়ে যাব। আমার হারমোনিয়াম three hundred fifty দিয়ে কেনা। বেষ্ট হারমোনিয়াম, তার ভয়েস দেখবেন চমৎকার। একেবারে চারমিং করে দেবে।

রিণি আর দাঁড়াতে পারছিল না। বললে, ওদিকে দেরি হয়ে যাচ্ছে দাদা।

বিনয় বললে, হ্যাঁ আজ আমি চলি। নমস্কার।

সুন্দর দেখলে, রিণি একেবারে বড় রাস্তায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। কাজেই আর এদের আট্‌কে রাখা উচিত নয়। বললে, নমস্কার। রাস্তার ওপর অনেকক্ষণ আপনাদের derail করে রাখলাম। বাই-বাই। সাহেবী কায়দায় হাত তুলে তাদের বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে একদৃষ্টে সেই দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো সুন্দর।

শিউলিতলা লেনের মানুষগুলির জীবনযাত্রা যেমন চলছিল আবার তেমনি চলতে লাগলো। পনেরো কুড়ি দিনের ভেতর উল্লেখযোগ্য এমন কোনও ঘটনাই ঘটলো না—যা শোনবার জন্যে অন্ততঃ থম্‌কে দাঁড়াতে হয়।

বিশু রোজ যেমন চোখে আইগ্লাস লাগিয়ে ঘড়ি মেরামতের কাজ করে; এখনও তেমনি করছে। ফণীবাবু তাঁর ফতুয়াটি গায়ে দিয়ে চটি জুতো পরে এসে বসেছেন তাঁর ঘরের দাওয়ায়, খবরের কাগজ পড়ছেন, চা খাচ্ছেন, বিশুর সঙ্গে গল্প করছেন। বেলা দশটা বাজতেই চারটি ভাত খেয়ে নিয়ে নিত্য নতুন সাহেবী পোষাক পরে সুন্দর বেরিয়ে যাচ্ছে তার আপিসে। বলছে নাকি তার এক বন্ধু বিজনকে নিয়ে সে আবার একটা নতুন 'বিজনেস' চালু করেছে।

চরণ-উকিল রোজ ঠিক এই সময়ে থলে হাতে নিয়ে বিড়ি টানতে টানতে বাজারে যাচ্ছে, বাজার থেকে ফিরছে। খেয়ে দেয়ে কালো রঙের ছেঁড়া ময়লা কোটটি গায়ে দিয়ে আদালতে বের হচ্ছে, ফিরে আসছে রাস্তায় আলো জ্বলবার পর। আর প্রত্যেকবার যাওয়া আসার পথে বিশুকে জিজ্ঞাসা করছে, ক'টা বাজলো। বিশু এখনও তাকে একটি সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড ঘড়ি বেচবার আশা পরিত্যাগ করেনি। প্রকাশ এখন আর ঠিক ন'টার সময় বাড়ী থেকে বেরোয়

না। খেয়েদেয়ে একটু বিশ্রাম করে দুপুরে শিউলিতলা লেন যখন প্রায় ফাঁকা হয়ে যায়, চুপি চুপি সেই সময়ে তার ছাতিটি হাতে নিয়ে শ্রীদুর্গা নাম জপ করতে করতে রওনা হয় চাকরির সন্ধানে। ফিরে আসে রাত্রে।

ওদিকে বিনয়ের বেলাও ঠিক তাই। কখনও দেখা যায় তারা দু'ভাই-বোন একসঙ্গে বেরিয়ে যাচ্ছে, আবার কখনও দেখা যায় একা একা।

ঘন ঘন যাওয়া আসা চলে শুধু পান্নালালের। কখন যায় আর কখন আসে কেউ কিছু বলতে পারে না।

একঘেয়ে এই জীবনযাত্রার মাঝে বৈচিত্র্য দেখা যায় শুধু পান্নালালের স্ত্রীর জীবনে।

ছাতের বৌদির নজর পড়েছে নীচের ঠাকুরপোর ওপর।

ছাতের বৌদি হলো পান্নালালের স্ত্রী করালী, আর নীচের ঠাকুরপো—প্রকাশের ভাই পরেশ।

পরেশ সেদিন তার খাটে শুয়ে গুন গুন করে গান গাইছে আর কি যেন লিখছে। দোরে খিল বন্ধ ছিল না, দোর ঠেলে চুপি চুপি ঘরে ঢুকলো রিণি আর করালী।

ঘরে ঢুকতেই রিণির হঠাৎ হাঁচি পেয়ে গেল। মুখে কাপড় চাপা দিয়ে হাঁচিটা চাপতে গিয়ে সে এমন একটা বিদকুটে শব্দ করে বসলো যে পরেশ পিছন ফিরে দেখেই গান বন্ধ করে দিয়ে ধড়মড় করে উঠে বসলো।

—এই যে ছাতের বৌদি, এসো এসো। আরে আপনি ? আসুন, আসুন নমস্কার!

ছাতের বৌদি হাসতে হাসতে রিণিকে ঠেলা মেরে বললে, মেয়েটা যেন কী! হাঁচি চাপতে গিয়ে এমন আওয়াজ করলে! দিলে সব মাটি করে। দিব্যি কেমন চুপি চুপি নীচের ঠাকুরপোর গানটা শুনছিলাম।

পরেশ বললে, গান শুনতে এসেছ বুঝি ?

করালী বললে, আজ্ঞে না। গান শোনাতে এসেছি।

এই বলে সে রিণির দিকে চোখের ইসারা করলে।

পরেশ বললে, ভাল, ভাল। উনি ভাল গান গাইতে পারেন আমি শুনেছি। গাইতে পারেন, নাচতে পারেন। তা বেশ তো, ওঁকে গাইতে বল, শুনি।

রিণির দিকে তাকিয়ে বললে, দাঁড়িয়ে কেন, বসুন।

করালী খাটের একপাশে নিজেও বসলো, রিণিকেও বসালে।

পরেশ বললে, এবারে গেয়ে ফেলুন।

করালী বললে, এত সহজে গাইবে না বোধ হয়। খোসামুদি-টোসামুদি কর, হাতে পায়ে ধর।

রিণি সলজ্জ হাসি হেসে বললে, না না দিদির কথা শুনবেন না আপনি। নাচতে গাইতে জানি কিন্তু সে সব দেখবার মতও নয়, শোনবার মতও নয়।

করালী বললে, তুই থাম্ দেখি! ওই রকম বলতে হয় তাই বলছে। কি লিখছিলে নীচের ঠাকুরপো? চিঠি?

—না চিঠি নয়। চাকরির দরখাস্ত।

করালী গালে হাত দিয়ে বলে উঠলো, ও মা, চাকরির দরখাস্ত? ছি! চাকর-বাকর আমাদের চলবে না। গান গাইতে গাইতে এমন তন্ময় হয়ে লিখছ দেখে ভাবলাম বুঝি প্রেমপত্র লিখছো। প্রেমিকা-ট্রেমিকা জুটেছে নাকি?

—না বৌদি। পরেশ চোখের ইসারায় রিণিকে দেখিয়ে দিয়ে বললে, সেরকম সৌভাগ্য কি হবে কোনদিন?

করালী বললে, কেন হবে না? ঘটকালি দিলে হতেও পারে।

ঘরের ভেতর থেকে মলিনার ডাক শোনা গেল, ঠাকুরপো। কে কথা বলছে তোমার সঙ্গে?

করালী বললে, আমি কথা বলছি দিদি। যাই।

যাই বলে নিজে উঠে দাঁড়িয়ে রিণিকে চড় চড় করে টেনে তুলতে তুলতে বললে, কি লা, মজে গেলি নাকি? আয়। রিণিকে তুলে নিয়ে ভেতরের দিকে যেতে যেতে পেছন ফিরে পরেশকে বলে গেল, দরখাস্ত-টরখাস্ত কর আগে, তারপর দেখাযাবে।

মলিনা পেছন ফিরে জল ধরছিল বালতিতে। তেমনি পেছন ফিরেই বললে, ওর মাথাটি কেন খাচ্ছিস বল্ দেখি?

---কার? তোমার ঠাকুরপোর?

—হ্যাঁ।

করালী বললে, মাথা ওর আছে নাকি যে খাব। বলেই সে ফিক্ ফিক্ করে হাসতে লাগলো।

মলিনা মুখ ফেরালো। ফিরিয়েই দেখে, করালী একা নয়, তার সঙ্গে রয়েছে রিণি।

মলিনা বললে, ওকে বুঝি নতুন সাক্‌রেদ কর্‌লি?

—ওর ঘটকালিই তো করছি দিদি।

মলিনা বললে, ওর ঘটকালি তোকে করতে হবে না। ও লেখা-পড়া-জানা আধুনিকা। চাকরি-বাকরি করবে, রোজগার করবে, তারপর কোন্‌দিন দেখবি নিজের ব্যবস্থা নিজেই করে নিয়েছে।

রিণি মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে শুনলে কথাগুলো।

করালী বললে, নিতে পারলে তো ভালই হতো, কিন্তু সে রকমের মেয়ে নয় বলেই তো নীচের ঠাকুরপোর সঙ্গে জুড়ে দিতে চাচ্ছি।

মলিনা বললে, আহা, কি উপকারই না তুমি করতে চাও রি— কথাটা শেষ হলো না। হঠাৎ নজের পড়লো রিণির দিকে। ওমা, তা বলতে হয়, রিণি রয়েছে দাঁড়িয়ে!

—তাতে কি হয়েছে দিদি, বড় জা—ধরতে গেলে একরকম মায়ের মতন। কত বকবে কত মারবে—

মলিনা এবার আর না হেসে থাকতে পারলে না। বললে, তোর

কি মাথার ছিট্ আছে নাকি ছাতের বৌ। আমি এর মধ্যে জা হয়ে গেলাম।

করালী বললে, নিশ্চয় হবে। আমি কি সহজে ছাড়বো নাকি ভেবেছ ?

—তা না হয় ছাড়লি না বুঝলাম। কিন্তু বাড়ীতে বসে থাকা বেকার ছেলের সঙ্গে রিণিকে জুটিয়ে কি লাভ হবে শুনি ?

—কি লাভ হবে জানি না দিদি। কিন্তু আমার বিশ্বাস —বলেই করালী রিণির দিকে তাকিয়ে বললে, তুই যা তো এখান থেকে। আমাদের মফঃস্বলী কথা আছে। রিণি চলে যেতেই করালী বললে, রিণি তো আমাদের কাছেই রয়েছে দিদি, আমি ওর মনের খবর জানি। রিণি ভালবেসে ফেলেছে নীচের ঠাকুরপোকে।

গম্ভীর হয়ে মলিনা বললে, ওকে ভালবাসা বলে না ছাতের বৌ ওটা বয়সের দোষ। চোখের নেশাকে তোরা ভালবাসা মনে করিস, তাই নেশা কেটে গেলে কেঁদে মরিস।

—না দিদি না, চোখের নেশা আর ভালবাসা—ছুটোকেই আমি চিনি। নিজে পাইনি বলে আমার জীবনটা মরুভূমি হয়ে গেছে,— তাই বলে তোমরা আমাকে—বলতে বলতে চোখছুটো তার জলে ভরে এলো। কথাটা করালী শেষ করতে পারলে না। মলিনা তার এ-রূপ কখনও দেখেনি। নিতান্ত হালকা একটা সাধারণ মেয়ে বলেই মনে হ'তো করালীকে। আজ কেমন যেন মুহূর্তেই তার সব ধারণা বদলে গেল।

মলিনা বললে, কি জানি ভাই আমরা সেকেলে মানুষ অত-সব বুঝি-টুঝি না। তা বেশ, তুই যা ভাল বুঝিস তাই করিস।

করালী খুশী হ'লো কথাটা শুনে। বললে, ব্যাস—তোমার কথা পেয়ে গেলাম, আর আমার কিছু চাই না। কিন্তু এই আমি বলে রাখলাম দিদি, ওদের বিয়ে দাও, মনের আনন্দে ওরা ছু'জনেই

দেখো রোজগার করবে। গাছতলায় গিয়ে যদি থাকে, তবু ওরা সুখে থাকবে, শান্তিতে থাকবে।

মলিনা বললে, থাক আর বক্তৃতা করতে হবে না তোকে তুই যা দেখি। আমার কাজ আছে।

গজ গজ করতে লাগলো।—একে নিজের ভাবনায় মরছি, ওঁর চাকরি নেই, ঠাকুরপো বেকার, কেমন করে দিন চলবে তার ঠিক নেই, আর উনি এলেন এই সময় বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক করতে—ভাব-ভালবাসার লেক্‌চার শোনাতে!

মলিনা ডাকলে, ঠাকুরপো! ঠাকুরপো!

পরেশ 'যাই' বলে সাড়া দিয়ে তাড়াতাড়ি এসে দাঁড়ালো।

—কি বলছো বৌদি?

—চার পয়সার নুন নিয়ে এসো। কি করছিলে? হ্যাঁ, তাড়াতাড়ি একটা কিছু ছাখো, নইলে বুঝতেই তো পারছো!

পরেশ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো।

মলিনা বললে, চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলে কেন? রিণির কথা ভাবছো নাকি?

—না রিণির কথা ভাবিনি। ভাবছি নুন আনতে যাব পয়সাটা কে দেবে?

মলিনা বললে, ও, পয়সা দিইনি বুঝি? নাও ওই টিনের কৌটোয় পয়সা আছে।

পয়সা নিতে গিয়ে পরেশ বললে, আমি না হয় রিণির কথা ভাবছিলাম, কিন্তু তুমি কার কথা ভাবতে ভাবতে পয়সা দেবার কথা ভুলে গেলে?

—আমি? বলে মলিনা পরেশের দিকে তাকিয়ে বললে, আমার একটি দেওর আছে, বিধবা মেয়ের মত বাড়ীতে বসে প্রেম করছে, তারই কথা ভাবছিলাম।

—ভেবো না বৌদি, মাথা খারাপ হয়ে যাবে।

এই বলে পয়সা নিয়ে পরেশ নুন আনতে চলে গেল।

একদিন বিকেলে দেখা গেল, শিউলিতলা লেনে একটি ছেলে এসে ঢুকল। ছেলেটির পায়ে ফিতে বাঁধা জুতো, তার ওপর লাল রঙের মোজা. ময়লা ধুতির ওপর রঙিন একটি সার্ট, হাতে একটি গামছার পঁটুলি। দেখলেই চেনা যায় সে পাড়াগাঁ থেকে আসছে।

শিউলিতলা লেনের সদা জাগ্রত প্রহরী বিশু চোখে আইগ্লাস লাগিয়ে ঘড়ি সারছিল ছেলেটি তার কাছে এসে দাঁড়ালো। জিজ্ঞাসা করলে, তিন নম্বর শিউলিতলা লেন, বাগবাজার, কলিকাতা কোন্‌টা বলতে পারেন মহাশয়?

বিশু মুখ তুলে তাকিয়ে দেখলে। দেখলে ছেলেটির একটি চোখ কানা। বললে, কি নাম?

—আমার নাম কানাই।

—কানা ছেলের নাম কানাই। মন্দ নয়।

—আজ্ঞে না মহাশয়, আমি কানা নই। এই চোখটায় একটু কম দেখি, এই চোখটায় দিব্যি দেখতে পাই।

বিশু আবার জিজ্ঞাসা করলে, কত নম্বর বললে?

কানাই আবার গড়গড় করে বলে গেল, তিন নম্বর শিউলিতলা লেন, বাগবাজার, কলিকাতা।

বিশু জিজ্ঞাসা করলে, কোত্থেকে আসছো?

—আমাদের গ্রাম থেকে আসছি। আবার কোত্থেকে আসবো?

—হুঁ, প্রকাশবাবু তোমার কে হ'ন্?

—আমার মেসো হয়।

বিশু এতক্ষণ পরে আঙুল বাড়িয়ে প্রকাশবাবুর বাড়ীর দোরটা দেখিয়ে বললে, ওই যে দেখছো দোরে একটা লেটার বক্স রয়েছে, ওইটে।

কানাই সোজা চলে গেল প্রকাশের দরজার কাছে। গিয়েই থমকে দাঁড়ালো। আবার বিশুর দিকে তাকিয়ে বললে, এই বাড়ী? কেউ নেই তো। দুয়োর বন্ধ।

বিশু সেইখান থেকে চেঁচিয়ে বলে দিলে, দোরের কড়া ধরে জোরে জোরে নাড়া দাও। চেঁচিয়ে ডাকো।

কানাই কড়া নাড়তে নাড়তে চেঁচাতে লাগলো, মাসী! মাসী!

মলিনা ডাক শুনেই ছুটে এসে দরজা খুলে দিলে—আরে কানাই যে!

—হ্যাঁ মাসী এলাম।

—একাই চলে এলি? কখন বেরিয়েছিলি বাড়ী থেকে?

—কাল সকালে।

—কাল সকালে? এত দেরি হলো আসতে?

কানাই ঘরের চৌকাঠের ওপর বসে পায়ের জুতোমোজা খুলতে খুলতে বললে, হবে না? ভুল ট্রেণে চেপে অনেক দূর চলে গিয়েছিলাম যে! তারপর আবার ফিরে এসে ঠিক ট্রেণটা ধরলেম।

মলিনা বললে, হাত পা ধুবি আয় আমার সঙ্গে। আমি ততক্ষণ এক পেয়ালা চা তৈরী করি তোর জন্যে।

—হ্যাঁ মাসী, চা খাব। কানাই তার এক-হাতে জুতো আর এক-হাতে গামছায় বাঁধা পুঁটুলিটি নিয়ে মাসীর পিছু পিছু যাচ্ছিল।

মলিনা বললে, ওগুলো রাখ ওইখানে। ওই ছ্যাখ্, ওই কলঘরে গিয়ে হাত পা ধুয়ে নে। চান করবি?

চান করবার কথাটা শুনে কানাই যেন লাফিয়ে উঠলো।

—ওরে বাবা, এই অবেলায় চান করবো কি মাসী? সঙ্গে সঙ্গে কাঁপ দিয়ে জ্বর আসবে।

—ম্যালেরিয়া?

—হ্যাঁ মাসী। কানাই কলঘরে গিয়ে ঢুকলো।

কানাইকে চা দিয়ে মলিনা জিজ্ঞাসা করলে, হ্যাঁরে কানাই, রাত্তিরে ভাত খাবি তো?

—হ্যাঁ মাসী, দুদিন ভাত খাইনি। চারটি ভাত খাব।

কানাই কলকাতা কখনও আসেনি। কলকাতা দূরের কথা, গ্রাম ছেড়ে শহরে কোনদিন গেছে কিনা সন্দেহ। সেই কানাই একা চলে এসেছে কলকাতার মত শহরে। এসেছে, খুঁজে বের করেছে শিউলিতলা লেনের এই বাড়ী। মলিনা রীতিমত অবাক হয়ে গেছে।—তা কানাই বাহাদুর ছেলে বলতে হবে। কলকাতার রাস্তা—চব্বিশঘণ্টা গাড়ী ঘোড়া চলছে, রোজ শুনছি কত লোক চাপা পড়ছে। কানাই চোখে ভাল দেখতে পায় না তবু ঠিক চলে এসেছে।

কানাই তাড়াতাড়ি বলে উঠল, না মাসী চোখে আমি ঠিক দেখি। এই চোখটা ঠিকই আছে, শুধু এই বাঁ-চোখটা একটু গড়বড় করে। এখানে শুনেছি মস্ত বড় বড় ডাক্তার আছে, আমার চোখটা একবার দেখিয়ে দিস মাসী।

মলিনা বললে, দেবো।

কানাই বললে, হ্যাঁ মাসী, কলকাতায় শুনেছি নাকি অনেক সব দেখবার জিনিস আছে?

—আছেই তো।

কানাই আবার বললে, হ্যাঁ মাসী, এখানে নাকি ছবিতে কথা বলে?

মলিনা বললে, হ্যাঁ বলে।

—সেই সব আমাকে দেখিয়ে দিস মাসী, জন্মের শোধ দেখে নি।

মলিনা বললে, সব দেখিয়ে দেবো। ঠাকুরপোকে বলে দিচ্ছি, দুদিনেই সব ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখিয়ে দেবে। তুই তো বেশিদিন এখানে থাকতে পারবি না। তোর বাবা রয়েছে একা। তুই চলে এলি, নিজে রান্না করে খাচ্ছে তো?

কানাই চুপ করে রইল। জবাব দিলে না।

—হ্যাঁরে কানাই, আসবার সময় তোর বাবা কি বললে? কাল সকালেই একখানা চিঠি লিখে দিস বাবা, নইলে সে ভাববে।

কানাই তার হাত থেকে চায়ের পেয়ালাটা নামিয়ে রাখলে।

—তুইতো নিজে লিখতে পারিস না, লিখিয়ে নিস ঠাকুরপোকে দিয়ে। ওকি? চা খাওয়া হয়ে গেল?

—হ্যাঁ।

কানাইয়ের চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছিল। তাই না দেখে মলিনা বললে, তবে যে বললি চোখ তোর ঠিক আছে?

কানাইয়ের চোখ দিয়ে এবার দরদর করে জল গড়িয়ে এলো। চীৎকার করে বলে উঠল কানাই, চিঠি কাকে দেবো মাসী? বাবা মরে গেছে।

কথাটা শুনে মলিনা একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেল।

—সে কি রে? একি সর্বনেশে কথা! কবে?

কানাই বললে, তুই আসবার পরেই মাসী। এই ছাখ না, শ্রাদ্ধের সময় মাথা কামিয়েছিলাম, এখনও ভাল করে চুল ওঠেনি।

—কি হয়েছিল?

—জ্বর হয়েছিল—চারদিন। ঘরের মেঝেয় আমি শুয়ে ছিলাম, বাবা ছিল খাটে। সকালে উঠে বাবার আর সারাশব্দ পেলাম না। কখন মরে গেছে জানতেও পারিনি। এই বলে কানাই তার মাসীর পায়ের কাছে আছাড় খেয়ে পড়ে কাঁদতে কাঁদতে বললে, আমাকে তুই তাড়িয়ে দিসনে মাসী, আমার আর কেউ নেই—কেউ নেই মাসী। আমি চাকরের মতন থাকবো, এইখানে দুবেলা দুটি খাব আর যেখানে হোক পড়ে থাকবো।

মলিনার দুচোখ দিয়ে তখন জল গড়াচ্ছে।

ওদিকে সুন্দরের নতুন আপিসটি তার বন্ধু বিজন সাজিয়ে

দিয়েছে চমৎকার ভাবে। দোরে নতুন ডোর-প্লেট দেওয়া হয়েছে—"MASTER ENTERTAINERS," ঝক্‌ঝক্ তক্‌তক্ করছে আপিসের ঘর দোর। একটা ঘরের দুদিকে দুটো সেক্রেটেরিয়েট টেবিল, গদি আঁটা ঘোরানো চেয়ার। জানলায় পর্দা টাঙ্গানো। বাথরুমে বেসিন, আর্শী। ওদিকে একটা প্রকাণ্ড হল-ঘর! মেঝেয় কার্পেট পাতা। দেয়ালে নানারকমের ছবি। ঘরের একদিকে একটা ঘরে নানা রকমের বাদ্যযন্ত্র।

কাজকর্ম এখনও ঠিক চালু হয়নি। দুই বন্ধুতে পায়তারা ভাঁজছে। কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে। নাচতে জানে গাইতে জানে—এই রকম সুন্দরী যুবতী মেয়ে চাই। দরখাস্ত এসে জড়ো হচ্ছে।

সুন্দরের আর-একটা নেশা আছে। শনিবার বিকেলে ঘোড়-দৌড়ের মাঠে যাওয়া। এটাকে নেশা বললে সে চটে যায়। বলে Business.

বিজন কিন্তু এ-নেশাটা ধরেনি। সুন্দর চেষ্টা করেছিল অনেক কিন্তু পারেনি ধরাতে।

বিজন সেদিন আপিসে বসে চা খাচ্ছিল, এমন সময় ট্যাক্সি করে এসে নামলো সুন্দর। ঘোড়দৌড়ের মাঠ থেকে আসছে সোজা। অনেকগুলো টাকা সেদিন সে হেরে এসেছে। মন-মেজাজ খুব খারাপ। মাথার টুপিটি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ডাকলে, বয়!

বয় এসে সেলাম করলে।

সুন্দর বললে, চা এণ্ড্ টোষ্ট্।

বয় চলে যেতেই সুন্দর তার চেয়ারে বসে টেবিলের ওপর পা তুলে দিলে।

বিজন বললে, আড়াই শ' টাকাই দিয়ে এলি তো?

সুন্দর চেঁচিয়ে উঠলো তার নিজস্ব ইংরেজি ভাষায়, Stop বাবা

Stop, Horses will be loughing if you are talking about them.

বিজন বললে, তোর এই ইংরেজিটা যদি বন্ধ না করিস তো আমি তোর ঘোড়া সম্বন্ধে কোনও কথা বলবো না। আচ্ছা, তোর এই ইংরেজি শুনে ঘোড়াগুলো হাসে না?

সুন্দর বললে, Look here এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের ইংরেজি শুনেছিস? তারা আমার চেয়ে ভাল ইংরেজি বলে না। যাকগে, শোন, আজ ক'টা দরখাস্ত এলো?

বিজন বললে, খাম চার পাঁচ এসেছে। আর এই ছাখ্—বলে সে একটা ইংরেজি কাগজ দেখিয়ে বললে, নাচিয়ে মেয়েদের একটা দল বিজ্ঞাপন দিয়েছে—কেউ যদি তাদের নাচাতে পারে তো নাচতে রাজী আছে।

সুন্দর হাত বাড়িয়ে খবরের কাগজটা তুলে নিয়ে দেখলে, বিজ্ঞাপনটার ওপর বিজনলাল পেন্সিলের দাগ দিয়ে রেখেছে। সঙ্গে সঙ্গে 'কলিং বেল' টিপলে।

বেল বাজতে লাগলো আপিস-ঘরের বাইরে, কিন্তু কেউ এলো না। আবার বেলটা সে বাজাতে যাচ্ছিল, বিজন বারণ করলে।

সুন্দর বললে, No one cares.

—কেয়ার করবে কে? একজনকে তো পাঠিয়েছিস চা-টোষ্ট আনতে, আর-একজন পাঁচটা বাজলেই চলে গেছে।

—Why? our office means evening office.

বিজন বললে, তাহ'লে সবাইকে বারোটার পর আসতে বলবি।

সুন্দর বললে, Yas. Tell them. Come at twelve, go at night.

ছেলেটা চা-টোষ্ট নিয়ে এসেছে। বিজন বললে, তাই হবে। চা'টা খেয়ে নে।

বয়টা চলে যাবার পর টোষ্ট খেতে খেতে সুন্দর বললে, We must answer this call.

বিজন জিজ্ঞাসা করলে, কোন্ কল্?

—এই যে Dancing girls' call. বলেই সে খবরের কাগজটা দেখিয়ে দিলে।

বিজন বললে, কল্ বলিস না, বল্ advertisement.

—All the same. বলেই সে কলিং বেল্‌টা বাজিয়ে দিলে। বয় এসে দাঁড়াতেই বললে, টাইপ্‌বাবুকে ডাকো।

একটা খাতা পেন্সিল হাতে নিয়ে টাইপবাবু এলেন। ভদ্রলোকের বয়স হয়েছে। নেহাৎ কপাল খারাপ তাই এখানে এসে জুটেছেন। খাতাটা জুৎ করে ধরে পেন্সিল উঁচিয়ে বললেন, বলুন কি লিখতে হবে।

সুন্দর চায়ের কাপটা শেষ করলে প্রথমে। তারপর খবরের কাগজটা দেখে বললে, Very important and urgent. লিখুন, My dear Sir—

বিজন বললে, না না Sir নয়, Sir নয়—এই বলে বোধকরি হাসি চাপতে না পেরে তাড়াতাড়ি উঠে চলে গেল।

সুন্দর বললে, yes, yes, doing mistake. লিখুন, My dear woman.

টাইপবাবুর এইবার হাসবার পালা। তিনি কিন্তু না হেসে রীতিমত গম্ভীর মুখে বললেন, woman কি ভাল হবে স্যার?

—বেশ, তাহলে লিখুন, My dear girls.

টাইপবাবু আর থাকতে পারলেন না। বললেন, Dear madam লিখলে ভাল হয় স্যার।

সুন্দর যেন বেঁচে গেল, বললে, বাস্ বাস্ বাস্, আপনি তো জানেন সব। লিখে দিন—বাবা ম্যাডাম্‌স, এইচিঠি like telegram

পেয়েছ কি এসেছ। এমনি সব যা লিখবার লিখে দিয়ে তলায় লিখে দেবেন —your most odedient servents.

টাইপবাবু দাঁতে দাঁত চেপে তাড়াতাড়ি খাতা-পেন্সিল নিয়ে উঠে চলে গেলেন। বললেন, এক্ষুনি টাইপ করে এনে দিচ্ছি।

এমনি করে চলছে সুন্দর আর বিজনের আপিস-আপিস খেলা।

কানাই রয়ে গেল প্রকাশের বাড়ীতে। বেচারা যাবেই-বা কোথায়? প্রকাশের চাকরি নেই। পরেশ বেকার। অথচ সংসারে আর একটি প্রাণী বাড়লো।

দোষ কারও নেই অথচ মলিনা যেন লজ্জায় মরে যেতে থাকে। প্রকাশ যে টাকাটা এনে দিয়েছে, তাতেই দু'বেলা ডাল-ভাত চলছে কোনরকমে। তারপর কি যে হবে মলিনা ভেবে আর কূল-কিনারা পায় না।

কানাই এক অদ্ভুত ছেলে। শিউলিতলা লেনে এমন বাড়ী নেই যে বাড়ীতে সে যায় না। এমন লোক নেই যার সঙ্গে সে ভাব করেনি। তবে তার ভাব যেন ছাতের মাসীর সঙ্গেই বেশি।

ছাতের মাসীর ভালই হয়েছে কানাইকে পেয়ে। বাজারের কোন-কিছু আনতে হলে আর পান্নালালকে ডাকতে হয় না। কানাইকে ডাকলেই হয়।

করালীর দেখাদেখি আশপাশের বাড়ীর সব মেয়েরাই জেনে গেছে—কানাইকে দিয়ে চাকরের কাজ করানো চলে। করালী চার পয়সার পান আনতে দিচ্ছিল কানাইকে। পাশের বাড়ীর বউ বললে, আমার দু'পয়সার। আবার বঁড়শের বৌ দাঁড়িয়েছিল তাদের জানলার পাশে। বললে, ওমা, আমারও যে পান বাড়ন্ত। ও বাবা কানাই, আমার কাছ থেকে পাঁচটা পয়সা নিয়ে যাও তো। পাঁচ পয়সায় আধগোছ পান পাবে। বুঝলে?

এই তিন বাড়ীর তিন রকমের পান আনতে গেল কানাই।

আসতে দেরি হচ্ছিল ; করালী তাই তার ছাত থেকে উঁকি মেরে দেখলে কানাই এসেছে কিনা।

মলিনা তাকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করল, কি দেখছিস ?

করালী বললে, কানাই রয়েছে বাড়ীতে ?

—কই না তো।

—ও কানা চাকরটিকে তুমি কোথায় পেলে দিদি ? করালী জিজ্ঞাসা করলে।

কানাই—চাকর। কথাটা শুনে মলিনা অবাক হয়ে গেল। ভাবলে মরুকগে ছাই, চাকরই ভাবুক ওকে। চাকরের মতন চেহারা, চাকরের মতন কথাবার্তা কানাইকে যদি তার বোনপো না ভেবে চাকর ভাবে ভাবুক। মলিনা বললে, ওকে কোথায় পেয়েছি, জিজ্ঞাসা করছিস ? যেখানে গিয়েছিলাম—আমার দিদির বাড়ী—যে দিদি আমার মরে গেল, সেইখান থেকে এসেছে ও। কেন ? কিছু করেছে নাকি ? দুষ্টুমি করলে ধম্‌কে দিস।

করালী বললে, দুষ্টুমি কি বলছো দিদি, কানাই খুব ভাল ছেলে। রোজ আমাদের বাজার করে দেয়। একা আমাদের নয় ; মন্তি বলছিল, টুনু বলছিল—সকলের কাজ করে।

—করুক। বলে মলিনা সরে গেল সেখান থেকে।

কানাই আসতেই মলিনা তাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললে. ছাখ কানাই, ছাতের বৌ, বঁড়শের বৌ —ওরা তোকে চাকর ভাবে।

কানাই বললে, ভাবুক না মাসী, ভাবলে তো আমার ভারি বয়েই গেল। তুই কিছু মনে না করলেই হলো।

কানাই তাকে 'তুই' বলে, মলিনার ভাল লাগে না। বললে, আমাকে 'তুই' বলিস কেন ? ওরা শুনলে কি ভাববে ? তুই বলিসনি তুমি বলবি।

কানাই বললে, হোক্।

মলিনার ভাবনা, কানাই চাকরের কাজ করে করুক, কিন্তু এমন কোন কাজ যেন সে না করে যাতে তাদের দুর্নাম হয়। অকলঙ্ক চরিত্র দেবতার মতো তার স্বামী, গরীব হতে পারে, কিন্তু মানুষের মতন মানুষ, কানাইয়ের অপকর্মের জন্য সে যেন মনে আঘাত না পায়।

মলিনা বললে, শুনলাম তুই ওদের বাজার করিস, কিন্তু দেখিস বাবা, কোনদিন যেন পয়সাটয়সা চুরিটুরি করিস না।

—চুরি কেন করবো মাসী? কানাই বললে, ভদ্দরলোকের ছেলে কখনও চুরি করে? ওদের সবাইকে তুমি জিজ্ঞাসা কোরো, দেখবে সবাই আমার প্রশংসা করবে, বলবে, কানাই ভারি সুন্দর বাজার করে। এখানে কেমন সব নতুন নতুন নাম মাসী, বিলিতী বেগুনকে বলে টমেটম। বঁড়শের মাসী সাবানকে বলে সাবাং।

এই বলে কানাই খিক্ খিক্ করে হাসতে লাগলো।

হাসি থামলে আবার আরম্ভ করলে, আমি সব শিখে ফেলেছি। জানিস মাসী—এই ত্যাখ আবার তুই বলে ফেললাম। দু'দিনে অভ্যেস করে নেবো মাসী, তুই কিছু ভাবিস না।

মলিনা বললে, তুই ভারি বক্ বক্ করিস কানাই। অত কথা বলিস না, বুঝলি? আর এমন কাজ কোনদিন করিস না যাতে তোর মেসোমশাইএর মাথা হেঁট হয়ে যায়।

—হোক্! বলে কানাই উঠে যাচ্ছিল।

মলিনা আবার ডাকলে। বললে, আবার যদি শুনি তুই আমাকে 'তুই' বলেছিস তাহলে আমি কিছু বাকি রাখবো না বলে দিচ্ছি।

কানাই আবার বললে—হোক্।

মলিনা হেসে বললে, হোক্ কিরে? বলবি 'আচ্ছা' বলবি 'বেশ' হোক্ তাদের পাড়াগাঁয়ের কথা।

কানাই বললে, হোক্। বলেই জিব কেটে, নিজের কান দুটো মলে বললে, অনেকদিনের উজ্যিস কিনা মাসী, তাই বলে ফেলি। যাই কাকাবাবুর কাছে যেতে হবে। ডেকেছে।

—তোর আবার কাকাবাবু কে রে ?

কানাই বললে, ছোট মেসো। তোমার ছুট্‌ঠাকুর। এই নাও, এখানে আবার ছুট্‌ঠাকুর বলে না। ঠাকুরপো বলে। তোমার ওই ছোট ঠাকুরপোটি বলেছে—আমি যদি ওকে কাকাবাবু বলেনা ডাকি তো চাঁটি মেরে মেরে আমার চাঁদি উড়িয়ে দেবে। তা ছাড়া এই ধরো হু'চারটে পয়সা বিড়ি-টিরি খাবার জন্যে—এই যাঃ। বলে সে জিব কেটে ছুটে পালিয়ে গেল।

ওদিকে "MASTER ENTERTAINERS" আপিসে সুন্দর মুখ ভারি করে বসে আছে। বিজন কোথায় যেন গিয়েছিল, ফিরে এসেই বললে, কিরে অমন করেবসে আছিস কেন ?

—very very bad news, বললে সুন্দর।

—কি হয়েছে বল্‌না। বলতে বলতে বিজন বসলো তার চেয়ারে।

সুন্দর উঠে এলো তার চেয়ার থেকে। বিজনের টেবিলের এ দিকে আগন্তুকদের বসবার যে চেয়ার হুটো ছিল তারই একটাকে ঘুরিয়ে নিয়ে ঘোড়ায় যেমন করে চড়ে তেমনি করে বসলো। বসে গলার আওয়াজটা একটুখানি নামিয়ে বললে, সেই পার্টির মেয়েগুলো এসেছিল।

বিজন বললে, চলে গেলো ? আমাকে দেখালি না ?

—Not like দেখবার, নইলে I must have shown you.

বিজন নিশ্চিন্ত হয়ে একটা সিগারেট ধরালে। একটা সিগারেট দিলে সুন্দরের হাতে।

সুন্দরকে ভারি চিন্তিত মনে হলো। সিগারেটটা ধরিয়ে খানিকটা ধোঁয়া ছেড়ে বললে, একটা মতলব করেছি শোন।

—বল্‌ শুনছি। কিন্তু বাংলায়।

—ভাল জিনিস বাংলায় I can not, can not—

বলতে বলতে খালি হাতের ইসারায় নিজের মুখটা দেখিয়ে দিতে লাগলো। ঠিক ইংরেজী কথাটা মনে পড়ছে না তার।

বিজন বলে দিলে, express –

—ঠিক। I can not express.

বিজন বললে, বল্ ইংরেজীতেই বল্।

সুন্দর চাপা গলায় বলতে লাগলো, মানে হচ্ছে গিয়ে—নাচের দল form করতে হলে we must get one beautiful girl. বাকিগুলো from this party and that party.

—সুন্দরী মেয়ে তুই পাচ্ছিস কোথায়? বাংলা দেশ একেবারে উচ্ছন্নে গেছে।

বিজনের ধারণা আমাদের 'লাভ্ ম্যারেজ্' হচ্ছে না বলে ঘরে ঘরে সব ভূতপ্রেত জন্মাচ্ছে। unwanted children কখনও সুন্দর হয় না।

বিজন বললে, সিনেমা থিয়েটারের দিকে তাকিয়ে ছাখ্। সুন্দরী একটাও নেই। একটা যদি আসে তো তাকে নিয়ে টানাটানি করে সবাই মিলে।

সুন্দর তাকে থামিয়ে দিলে।—Stop father stop. আছে আছে—আমার সন্ধানে, একটা আছে। I has one. সেই যে তোকে বললাম সেদিন পান্নালালের ছাতে থাকে—রিণি। my darling Rini।

সুন্দর চোখ বুজে একবার রিণির ধ্যান করে নিলে বোধহয়।

তারপর বলতে লাগলো, তার দাদার চাকরি নেই, my father's charitable boy. কিন্তু মেয়েটার তেজ খুব। hot fire.

বিজন বললে, টাকা ছাড়্। টাকা ছেড়ে ছাখ্—অভাব যখন এত আমার মনে হয় হয়ে যাবে। আমাকে একদিন দেখাতে পারিস্?

সুন্দর বললে, আমার একদিন যাবার কথা আছে –with my harmonium.

বিজন বললে, চল আমিও তোর সঙ্গে যাই।

—All right! চল।

সেই পরামর্শ ঠিক রইলো। তারা দুই বন্ধুতে যাবে একদিন রিণিকে দেখতে। মেয়েটা নাচতে জানে, গাইতে জানে। রিণিকে পেলেই নাচের দল তারা করে ফেলবে।

রিণির দাদা বিনয় চাকরির জন্যে দিবারাত্রি ঘুরে বেড়াচ্ছে, রিণি নিজেও ঘুরে বেড়াচ্ছে, কিন্তু কোথাও কিছু হচ্ছে না। কি কষ্টে যে তাদের দিন চলছে তা একমাত্র তারাই জানে। কাউকে সে কথা তারা জানাতে চায় না। নিজের দুঃখের ভাগ কাউকে দিতে চায় না তারা। রিণির বাইরে বেরুবার শাড়ি মাত্র একখানি। সেইটিকেই সাবান দিয়ে কেচে কেচে শুকিয়ে শুকিয়ে পরে। সেদিন কাপড়টায় সাবান দিয়ে রেখেছিল। আলু-ভাতে আর ভাত চারটি মুখে দিয়ে বিনয় বেরিয়ে গেছে। রিণিও চারটি মুখে দিয়ে চুপি চুপি ভিজে শাড়িটা নিয়ে ঘরে খিল বন্ধ করেছে। ভেবেছে করালী এই সময় ঘুমোবে, এই অবসরে কাপড়টা শুকিয়ে নেবে সে।

শতচ্ছিন্ন একখানি শাড়ি ছিল রিণির, তাতে আর লজ্জা নিবারণ হয় না। সেটা সে কোমরে জড়িয়ে নিলে কোন রকমে। এদিক ওদিক ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পরবার জন্যে না, টানাটানি করতে গিয়ে আবার খানিকটা ছিঁড়ে গেল। চোখদুটো জলে ভরে এলো রিণির। এই কি জীবন? মানুষ কিসের সুখে বেঁচে থাকে এ-পৃথিবীতে? এর চেয়ে বোধকরি আত্মহত্যা করাই ভালো। কিন্তু তাও তো পারে না। দাদা যে কাঁদবে। যাক্‌গে, আর ভাবতে পারে না।

ছেঁড়া জামাটা গায়ে দিতে দিতে হেসে ফেললে রিণি। বড় দুঃখের হাসি। জামা তো নয় কয়েক ফালি ছেঁড়া কাপড়। পরা না পরা দুইই সমান। রিণি তার ভিজে শাড়ির একটা দিক বাঁধলে একটা বাঁশে আর একটা দিক হাতে ধরে বসলো এসে একটা কেরোসিন-

কাঠের বাক্সের ওপর। তারপর হাতটা নেড়ে নেড়ে কাপড়টা ছুলিয়ে ছুলিয়ে তাড়াতাড়ি কাপড়টা শুকিয়ে নেবার ব্যবস্থা করলে। কিন্তু এমনি পোড়াকপাল, ঠিক এই সময়েই বাইরে কড়া নাড়ার শব্দ।

রিণি বলে উঠলো, কে?

—দিন দুপুরে খিল বন্ধ করে কি করছিস?

করালীর কণ্ঠস্বর। রিণি জবাব দিলে না। চুপ করে রইলো।

করালী বললে, আ-মর্। সাড়া দিচ্ছিস না কেন? গলায় দড়ি লাগিয়ে ঝুলছিস না তো? দেখিস বাবা, ওই কাজটি বাদ দিয়ে যা করবি কর। রিণি! রিণি!

এত দুঃখেও রিণি আবার হেসে ফেললে।

হাসির শব্দ শুনে করালী নিশ্চিন্ত হলো। বললে, খাচ্ছিস নাকি?

রিণি ভেতর থেকে বললে, হ্যাঁ খাচ্ছি।

করালী বললে, বেশ তো কালিয়া-পোলাও খাচ্ছিস না তা জানি। খোল্ না।

তবুও খুললে না রিণি। আপন মনেই কাপড় শুকোতে লাগলো। এসময় খোলা যায় নাকি?

—আচ্ছা মেয়ে তো। করালী আবার বললে, খুলবি?

রিণি ভেতর থেকে জবাব দিলে, না খুলবো না।

করালী বললে, মর্ তবে, গেল্ ভাল করে। বলেই সে চলে গেল।

দূর ছাই! কাপড়টাও যে তাড়াতাড়ি শুকোচ্ছে না! রিণি ঘন-ঘন হাত নাড়তে লাগলো।

ওদিকে ঠিক সেই সময় দেখা গেল, সিঁড়ির কাছে এসে দাঁড়িয়েছে সুন্দর আর বিজন। সুন্দর নিজেই তার পূর্ব প্রতিশ্রুতি মত হারমনিয়ামটা বগলে করে নিয়ে এসেছে। ভারি হারমনিয়াম। আর যেন পারছিল না ধরে রাখতে। ধীরে ধীরে সেইখানে নামালে সেটা। নামিয়ে বিজনকে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করলে, যাব?

বিজন বললে, বারে! যাবি না তো এলি কি জন্যে!

—হ্যাঁ যাই। বলে দু'পা এগিয়ে গিয়ে সুন্দর আবার ফিরে এলো বিজনের কাছে। চুপি চুপি বললে, দোর বন্ধ।

—বেশ তো, কড়া নাড়্ না!

—তুইও আয় আমার সঙ্গে।

বিজন ও সুন্দর দু'জনেই পাশাপাশি গিয়ে দাঁড়ালো রিণির ঘরের বন্ধ দরজার কাছে। হারমনিয়ামটা রইলো সিঁড়ির কাছে নামানো।

সুন্দর কড়া নাড়লে।

রিণি ভাবলে, করালী আবার এসেছে। এত ঘন ঘন ডাকাডাকি করছে কেন রে বাবা! মরুকগে ছাই, দেখবে তো তার এই অবস্থা। তার কাছে রিণির গোপন কিছুই নেই। এই ভেবে রিণি সেই অবস্থাতেই তাড়াতাড়ি এসে দোর খুলে দিয়েই কি যেন বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু সর্ব্বনাশ! দোরের কাছে সুন্দর আর একজন অপরিচিত ভদ্রলোক। মুখের কথা তার মুখেই-আট্‌কে রইলো। লজ্জায় যেন মরে গেল মেয়েটা। সঙ্গে সঙ্গে দোরটা বন্ধ করে দিয়েছে অবশ্য কিন্তু মাথাটা যেন ঝিম্ ঝিম্ করছে, পায়ের নীচের মাটি যেন সরে যাচ্ছে। ছি ছি এ কি দুর্ভোগ! একি লাঞ্ছনা!

বিজন আর সুন্দর—তারাও কম অপ্রস্তুত হলো না।

—ছি ছি, এ সময় আসাটা আমাদের উচিত হয়নি।

বিজন বললে, অন্য কোন সময় এলেই যেন ভাল হতো।

সুন্দর একটু বেশি নির্লজ্জ। এরকম নিরাভরণা রিণিকে দেখতে পাওয়াটাই সে যেন তার সৌভাগ্য বলে মনে করছে। বললে, অন্য সময় এলে তো আর—beautiful form—কেমন দেখলি?

বিজন বললে, চমৎকার। দ্যাখ হাজার টাকা পর্যন্ত উঠবি।

সুন্দর এতটা ভাবতে পারেনি। এক হাজার টাকা মানে?

বললে, খুব বেশি হল না?

বিজন বললে, হোক্ বেশি। টাকা আমার। আমি দেব। চললাম। বলে সে সত্যিই চলে গেল।

সুন্দর সেইখানে হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলো। পকেট থেকে একটা সিগারেট বের করলে। সিগারেটটা দেশলাইয়ের ওপর ঠুকতে ঠুকতে ভাবছে কি করবে, এমন সময় রিণির দরজায় খুট্ করে একটা আওয়াজ হ'লো। সিগারেট ধরাবার আর অবসর পেলে না সুন্দর। চোখের সামনে দেখলে রিণি তার ঘর থেকে বেরিয়ে কোন দিকে না তাকিয়েই সোজা চলে যাচ্ছে করালীর ঘরের দিকে।

সুন্দর তার পিছু পিছু গিয়ে বললে, দেখুন, আপনার সঙ্গে আমার একটা urgently talk মানে সেদিনের সেই—

কথাটা শেষ হলো না। রিণি ঢুকে পড়লো ভেতরে। কথাটার জবাব দেওয়া দূরে থাক্, তার দিকে একবার ফিরেও তাকালে না।

রিণিকে দেখেই করালী বলে উঠলো, গেলা হ'লো ?

রিণি বললে, হলো। কিন্তু ওই লোকটার হাত থেকে কেমন করে রেহাই পাই বলতে পারো ?

করালী বুঝতে পারলে না। বললে, কার হাত থেকে ? কার কথা বলছিস ?

রিণি বললে, তোমাদের ওই সুন্দরবাবু। ফণীবাবুর ছেলে।

—কি জন্যে এসেছে মুখপোড়া ? বলতে বলতে করালী তার কাছে এসে দাঁড়ালো।

রিণি বললে, আমাদের উপকার করতে।

—বোস্! কি হয়েছে বল্।

বলেই তাকে তার খাটের ওপর বসিয়ে দিতে গিয়ে করালীর হাত পড়লো রিণির গায়ে। দেখলে তার পরণের কাপড়টা ভিজে।

—ওমা একি! ভিজে কাপড় পরেছিস কেন ? ভিজে জ্যাব্-জ্যাব্ করছে—অসুখ করবে যে।

কথাটা বলতে গিয়ে করালী বুঝতে পারলে—কেন সে ভিজে কাপড় পরেছে। দুঃখে বেদনায় মুখখানা তার অন্যরকম হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি তার নিজের একখানা শুক্‌নো কাপড় এনে রিণির গায়ের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে বললে, পর্‌।

রিণি বললে, ছাখো না, মুখপোড়া দাঁড়িয়ে রয়েছে ওইখানে। এই বলে শুকনো কাপড়খানা পরবার জন্যে রিণি পাশের ঘরে চলে গেল।

করালী মুখ বাড়িয়ে দেখলে, ছাতে দাঁড়িয়ে রয়েছে সুন্দর। জিজ্ঞাসা করলে, কিছু বলছো?

সুন্দর বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ। কিন্তু আপনাকে নয়—ওঁকে।

—ওঁক মানে রিণিকে?

সুন্দর বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ।

—রিণি, আয় তো একবার বেরিয়ে।

ভেতর থেকে রিণি জবাব দিলে, যাচ্ছি!

সুন্দর একটু ঘাবড়ে গেছে মনে হলো। রিণি আসতেই বলে উঠলো, দেখুন, আমি তখন unknowingly কড়াটা নেড়েছিলাম। তার জন্যে I am begging your forgetfulness.

করালী বললে, এই কথা?

সুন্দর বললে, আজ্ঞে না। মানে বলছিলাম—মানে এখানে দাঁড়িয়ে standingly standingly সে কথা বলা চলে না।

—তা বেশ তো, ওইখানে বসে বসে বল। এই বলে করালী তার সেই অদ্ভুত হাসি হেসে বললে, আঁচল পেতে দেবো?

রসিকতাটা সুন্দর বুঝলে না। বললে, না না কিছু পাততে হবে না। আমি বলছিলাম রিণি দেবীর কথা। ওঁর দাদা বিনয়বাবু দস্তুরমত একজন educated young man কিন্তু দেখুন—

করালী বললে, দেখবো কি—ইংরেজী যে আমি জানি না ছাই!

—Oh yes, am I sorrowful. সুন্দর বললে, আপনি কিন্তু বড় বেশি হাসছেন।

—নে বাবা হাসবারও জো নেই ? না হেসে আমি ভাই থাকতে পারি না। তা বেশ আমি চলে যাচ্ছি। তুমি যাকে বলতে এসেছ তাকেই বল।

করালী সত্যিই চলে যাচ্ছিল। চলে যাচ্ছিল একটু মজা করবার জন্যে। রিণি কিন্তু তাকে যেতে দিলে না। তার আঁচলটা টেনে ধরলে।

সুন্দর বললে, ওর দাদার চাকরি নেই, ইনকাম নেই, ওদের খুব কষ্ট হচ্ছে। তাই আমরা পরামর্শ করে ঠিক করেছি—আমাদের Master entertainers কোম্পানীটা আবার চালু করবো। ধরো আমরা যদি প্রত্যেক শহরে সিনেমা-হলগুলো ভাড়া নিয়ে খুব advertisement মানে বিজ্ঞাপন দিয়ে টিকিট বিক্রী ক'রে শো দিই, তাহলে, বেশ ভাল হবে। এই পর্যন্ত অনেক কষ্টে ইংরেজি না বলে শেষে আর থাকতে পারলে না। বললে, That is very very better that your কষ্ট করে থাকা। না কি বলেন, এ্যাঁ ?

রিণি কি যেন বলতে যাচ্ছিল, সুন্দর বলতে দিলে না। কারণ আসল কথাটা এখনো তাকে শোনানো হয়নি। চট্ করে বলে বসলো, তার জন্যে আমরা আপনাকে মাসে মাসে হাজার টাকা পর্যন্ত দিতে পারি।

রিণি বললে, তার মানে আপনাদের সঙ্গে আমাকে যেখানে সেখানে নেচে নেচে গেয়ে গেয়ে বেড়াতে হবে, আর তার জন্যে আপনি আমাকে টাকার লোভ দেখাচ্ছেন ?

রিণির ভাবভঙ্গি দেখে সুন্দর একটু বিচলিত হয়ে পড়লো। বললে, No-no-no-no টাকার লোভ মানে—

করালী আর চুপ করে থাকতে পারলে না। বললে, শোনো সুন্দর ঠাকুরপো, তুমি একটি বিয়ে কর। মেয়েটি যেন নাচতে

গাইতে পারে। সে নিজে নাচবে, তোমাকেও নাচাবে। কেন মিছিমিছি পরের মেয়েকে নিয়ে টানাটানি করছো। যাও। তোমার বৌ যদি নাচে, আমরাও নাচবো। যাও আর দাঁড়িয়ে থেকো না।

করালী যে তাকে এরকম কথা বলবে তা সে আশা করেনি। তবে পাড়া-সম্পর্কে বৌদিদি হয়, যা বলছে বলুক। হাজার টাকার কথাটা বলা হয়ে গেছে। রিণি এখন ভাবুক বসে বসে।

সুন্দর চলে যাচ্ছিল। বললে, তুমি আমার কথাটা ঠিক বুঝতে পারলে না বৌদি।

—খুব বুঝেছি। করালী বললে, যাবার সময় তোমার ওই হারমনিয়ামটাও নিয়ে যাও।

সুন্দর কিন্তু নিলে না হারমনিয়ামটা। বললে, থাক ওটা তুলে রাখুন। আর একদিন এসে রিণি দেবীর গান শুনে যাব।

করালী বললে, আমাদের এখানে কিন্তু বড় বড় ইঁদুর আছে, যদি কেটে দেয় তো জানি না।

—না না ইঁদুর will not cut বলতে বলতে পালালো সুন্দর।

সিঁড়ি দিয়ে তরতর করে নেমে যাচ্ছিল, পান্নালাল ঠিক সেই সময় আসছিল ওপরে। দু'জনের মুখোমুখি দেখা। সুন্দরই প্রথমে বলে উঠলো, Good morning। Good morning।

পান্নালাল ভারি মজার মজার কথা বলে। বললে, মর্ণিং কখন কাবার হয়ে গেছে, আর তোমার এখন বুঝি মর্ণিং হচ্ছে? ইঁদুরের কথা কি হচ্ছিল?

সুন্দর বললে, আমার হারমোনিয়ামটা রেখে গেলাম এইখানে। তা বৌদি বলছেন এখানে বড় বড় ইঁদুর আছে, কেটে দেবে।

—ওরে বাবা, ইঁদুর বলে ইঁদুর! ইয়া বড় বড় ধেড়ে ধেড়ে ইঁদুর। হুলো বেড়ালগুলো পর্য্যন্ত ভয়ে পালায়। তোমার হারমোনিয়াম কাল পর্যন্ত থাকলে হয়।

সুন্দরের ভয় হলো। বললে, সত্যিই কাটবে নাকি?

—না কাটবে না পান্নালাল বললে, তুলে নিয়ে গিয়ে বাজাবে।

সুন্দর হেসে উঠলো।—Oh you are joking

পান্নালাল বললে, তুমি তো বলছো জোকিং, কিন্তু আমি যে মুস্কিলে পড়েছি। টাকার জন্যে ছুটে ছুটে বেড়াচ্ছি। রিণির দাদার এখনও চাকরি হলো না, তিন মাসের ভাড়া বাকি পড়ে গেছে। কি করে দেবে তাও তো বুঝতে পারছি না।

—ভাড়া কত?

—তিন মাসের পঁচাত্তর টাকা।

— All right. বলেই সুন্দর তার প্যাণ্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে নোট বের করলে অনেকগুলো। তাই থেকে গুণে গুণে সাতখানা দশ টাকার আর একখানা পাঁচ টাকার নোট পান্নালালের হাতে দিয়ে বললে, Take it.

পান্নালাল নোট পেয়ে আনন্দে একেবারে আত্মহারা হয়ে গেল কিন্তু ঠিক বুঝতে পারলে না সুন্দর কেন এতোগুলো টাকা দিলে। বিনয়ের জন্যে নয় সেটুকু বুঝবার ক্ষমতা তার আছে। দিলে নিশ্চয়ই রিণির জন্যে।

নোটগুলি পকেটে রেখে পান্নালাল বললে, সুন্দর একটা মানুষের মতন মানুষ হয়ে উঠলো যাহোক্।

খোসামুদি হলেও সুন্দরের মন্দ লাগলো না কথাটা। বললে, But তোমাকে একটি কাজ করতে হবে পান্নাদা!

—কি কাজ বল।

সুন্দর বললে, আমাদের একটা কোম্পানী আছে জানো তো?

পান্নালাল বললে, না, তা তো জানি না।

সুন্দর বললে, শোন তবে। আমাদের কোম্পানী হচ্ছে গিয়ে নাচ-গানের কোম্পানী। আমরা সারা দেশে নাচ-গানের শো দেখিয়ে দেখিয়ে বেড়াই।

পান্নালাল হাসলে। বললে, তুমি আবার দেশে দেশে বেড়ালে কখন? বাড়ীতেই তো আছ।

সুন্দর বললে, আমি নাই বা বেড়ালাম, আমার লোক আছে। শোনো শোনো, আগে আমার কথাটা শোনো ভাল করে।

এই বলে গলার আওয়াজটা একটু খাটো করে যাতে কেউ না শুনতে পায় এমনি ভাবে বললে, রিণিকে যদি আমাদের কোম্পানীতে নাচবার জন্যে রাজী করিয়ে দিতে পারো তো তোমাকে আমি খুশী করে দেবো। আর রিণিকে কি দেবো জানো? মাসে এক হাজার টাকা মাইনে।

হাজার টাকা মাইনে শুনে চমকে উঠলো পান্নালাল। বললে, এক হাজার টাকা মাসে মাইনে দেবে?

—হ্যাঁ দেবো।

—আর আমাকে কি দেবে?

সুন্দর বললে, তোমাকে দেবো একশ' টাকা।

—তা আমাকে কি করতে হবে?

—ওই তো বললাম রিণিকে রাজী করাতে হবে।

পান্নালাল বললে, তার জন্যে একশ' টাকা দেবে আমাকে? তার চেয়ে মাসে মাসে আমাকে একটা কিছু দেবার ব্যবস্থা করে দাও না? আমাকে নাও না তোমার কোম্পানীতে।

সুন্দর বললে, তোমাকে নিয়ে কি করবো?

—বারে আমাকে নিলে আমার বৌও যাবে আমার সঙ্গে।

—তোমার বৌ নাচতে পারবে?

—শিখিয়ে নেবে। পান্নালাল বললে, চেহারা তো খারাপ নয়। শিখিয়ে নিলে নাচতেও পারবে, গাইতেও পারবে। এখন নাহয় কিছু কম করে দিও।

সুন্দর দেখলে রাজী হওয়া ছাড়া উপায় নেই। পান্নালালকে

দিয়েই কাজ হাসিল করতে হবে। বললে, আচ্ছা তাই করবো। কিন্তু তার আগে রিণিকে রাজী করাতেই হবে।

—তা আমি করে দিচ্ছি ছাখো।

—তাহলে এই কথা রইলো। এই বলে সুন্দর চলে গেল।

পান্নালালকে সুন্দর চেনে। পঁচাত্তর টাকা বোধহয় গেল। সে কিছু করতে পারবে বলে মনে হলো না। পান্নালাল তার বৌয়ের ভয়ে অস্থির। কথাটা বোধহয় সে প্রথমেই তুলবে তার বৌয়ের কাছে। বৌ দেবে ধমকে। বাস্ সেইখানেই চুপ করে যাবে। তাই চারি দিকে জাল ফেলে রাখা ভাল।

সন্ধ্যায় সেদিন কানাইএর সঙ্গে দেখা।

সুন্দর ডাকলে, কানাই, শোন্!

কানাই কাছে এগিয়ে এলো—কি বলছো সুন্দরদা?

—হ্যাঁরে কানাই, তোদের পরেশের সঙ্গে রিণির বিয়ে হবে শুনেছিস?

কানাই বললে, কই না। শুনিনি তো।

সুন্দর বললে, হ্যাঁ হবে। আমি জানি। তুই একটি কাজ করতে পারিস?

—কি কাজ বল।

সুন্দর বললে, তার আগে বল্ তোর মাসী তোকে কিরকম ভালবাসে।

—আমাকে? আমার মাসী? কানাই বললে, খুব।

সুন্দর বললে, তোর মাসীকে বলে কোনরকমে এই বিয়েটা যদি ভেঙ্গে দিতে পারিস তো তোকে আমি একশ' টাকা দেবো।

—দেবে? সত্যি বলছো সুন্দরদা?

সুন্দর বললে, হ্যাঁ হ্যাঁ, সত্যি বলছি। কিন্তু কেমন করে বলবি বল্ দেখি তোর মাসীকে?

কানাই বিপদে পড়লো, আম্‌তা আম্‌তা করে বললে, কেমন

করে—মানে, সে আমি তোমাকে বলবো না কিন্তু বিয়েটা আমি ঠিক ভেঙে দেবো তুমি দেখে নিও।

সুন্দর বললে, না শোন্। টাকার জন্যে রিণি আমাদের কোম্পানীতে নাম লিখিয়েছে। আমাদের একটা কোম্পানী আছে কিনা—Master entertainers. নাচের দল নিয়ে আমরা দেশে দেশে ঘুরে বেড়াই। সেই দলে রিণিও ঘুরবে। নাচবে, গাইবে মাইনে পাবে মাসে এক হাজার টাকা। সেই নাচিয়ে মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেবে পরেশের? তোর মাসীকে বেশ intelligently বলবি এই সব কথা। understand?

কানাই বললে, ঠিক আছে।

সুন্দর চট করে তার পকেট থেকে একটা টাকা বের করে কানাইএর হাতে দিয়ে বললে, এই নে ধর।

কানাই কিন্তু নিতে চাইছিল না টাকাটা।

কথাটা বলতে কানাই কিন্তু দেরি করলে না। সেই দিন রাত্রেই খাওয়া দাওয়ার পর ভাবলে এইটেই উপযুক্ত সুযোগ। চুপি চুপি রান্নাঘরে গিয়ে দাঁড়ালো। মলিনা একবাটি মুড়ি নিয়ে খেতে বসেছিল। কানাইকে আসতে দেখেই মুড়ির বাটিটা পেছন দিকে লুকিয়ে ফেললে। বললে, কিরে, কি বলছিস?

কানাই চুপ করে তার সামনে গিয়ে বসলো। বসে বললে, তোদের এ পাড়াটি বেশ মাসী।

বলেই জিব কেটে বললে, এ হে হে, আবার তোকে তুই বলে ফেললাম।

মলিনা ভারি বিপদে পড়ে গেল। সে যে মুড়ি খাচ্ছে—সেটা গোপন করতে চায় কানাইয়ের কাছে। আর ঠিক এই সময় কানাই এসে বসলো গল্প করবার জন্যে।

মলিনা বললে, গল্প করতে এলি বুঝি?

—হ্যাঁ মাসী।

—গল্প করবার সময়টি বেশ! খাওয়া হয়ে গেছে, যা শু'গে যা। এসময় গল্প করতে হয় না! কাল শুনবো।

কানাই তবু উঠলো না। বললে, না মাসী, গল্প নয়। আমি কি বলছিলাম শোনো। ভারি মজার কথা। এ পাড়ায় কারো তো চাকরি বাকরি নেই, সব বেকার। ওই যে গো রিণির দাদা বিনয়—এদিকে নেই, ওদিকে খুব। পয়সা দেবার ক্ষমতা নেই, অথচ চায়ের দোকানে চা খেয়েছে আড়াই টাকার। দিতে পারছে না। দোকানদার ধরেছিল। আর এই যে আমাদের ছোট মেসো—না না কাকাবাবু, সেও তাই। তারও ধার হলো বারো আনা।

মলিনা বললে, আঃ ও-সব কাল শুনবো বাবা। আজ তুই এখন যা দেখি। বলেই মুড়ির বাটিটা পাছে তার নজরে পড়ে যায় ভেবে হাত দিয়ে সরাতে গিয়ে মলিনা ধরা পড়ে গেল।

কানাই বলে উঠলো, ও বুঝেছি। এই জন্যেই তুই আমাকে সরাতে চাচ্ছিস? আমাকে ভাত খাইয়ে তুই মুড়ি খাচ্ছিস?

মলিনা বললে, আজ আমার শরীরটা ভাল নেই বাবা।

—ত্যাখ্‌ মাসী। কানাই বললে, কানাই কানা হতে পারে, কিন্তু বোকা নয়! আমাকে ভাত খাইয়ে রোজ তুই মুড়ি খাস্—আমি বুঝতে পারছি। তাই তো বলি মুড়িওলা রোজ রোজ মুড়ি দিয়ে যায় কার জন্যে?

—বাবারে বাবা, শরীর ভাল না থাকলেও ভাত খেতে হবে? তোর অত সব দেখবার দরকার কি?

মলিনা ভাবলে দেখেই যখন ফেলেছে তখন ভাল করেই দেখুক। এই না ভেবে মুড়ির বাটিটা সামনে টেনে এনে বললে, নে বল্‌ তোর কাকাবাবুর কথা। কি বলছিলি বল্‌।

কানাই ভাবছিল রিণির সঙ্গে পরেশের বিয়ের কথাটা কেমন করে পাড়া যায়। বললে, কাকাবাবু আমাকে বলছিল, বারো আনা পয়সা ধার দে, চায়ের দোকানের দেনাটা মিটিয়ে দিই।

আচ্ছা, আমি কোথায় পাই বলতো মাসী? তবে হ্যাঁ; চায়ের দোকানের পয়সা ওকে এখন দিতে হবে না। দোকানের মালিকের সঙ্গে আমার খুব ভাব হয়ে গেছে। আমি একবার বলে দিলেই ব্যাস, আর পয়সা চাইবে না।

মলিনা বললে, বাবাঃ, তুই তাহ'লে মস্ত একজন কেউ-কেটা হয়ে গেছিস্ বল্।

কানাই কথাটার প্রতিবাদ করলে না। শুধু তার কানা চোখটা আরও ছোট করে দিয়ে মুখ টিপে টিপে হাসতে লাগলো—তবে মাসী, কাকাবাবু খুব বদমাস্ আছে। আমি ওকে এত ভালবাসি আর ও আমাকে দেখতে পেলেই আমার মাথায় চটাং চটাং করে চাঁটি মেরে ডুগিতবলা বাজায়। গান গাইতে জানে বলে ভারি অহঙ্কার।

মলিনা হেসে ফেললে। বললে, আচ্ছা বারণ করে দেবো। কোথায় সে? ঘুমিয়ে পড়েছে নাকি?

—ঘুমোবে কি গো, ঘুম কি তার চোখে আজকাল আছে নাকি? তার ওপর তুমি বলে দিয়েছ—রিণির সঙ্গে ওর বিয়ে দেবে।

মলিনা বললে, কে বললে আমি বলেছি?

কানাই বললে, বলতে কেন হবে মাসী? পাড়ার সবাই জানে। দু'জনের ভাব-সাব যে আজকাল খুব। চাকরি খুঁজতে যাচ্ছি বলে দু'জনে বেরিয়ে যায়, তারপর একসঙ্গে খুব খানিকটা বেড়িয়ে-চেড়িয়ে রাত্তিরে ফিরে আসে।

কথাটা মলিনার ভাল লাগলো না। বললে, ডাক না ওকে। এক্ষুনি বারণ করে দিচ্ছি।

—সে কি আছে নাকি বাড়ীতে? পূজোর সময় বস্তির মাঠে থিয়েটার হবে কিনা, তাই ভদ্রাদের ওখানে গেছে রিহার্শ্যাল দিতে—আচ্ছা মাসী, সত্যিই ওদের বিয়ে হবে নাকি?

মলিনা বললে, দাঁড়া আগে রোজগারের ব্যবস্থা করুক, তারপর বিয়ের কথা ভাববো।

কথাটাকে কানাই ঠিক জায়গায় এনে ফেলেছে। এই বার আসল কথাটা বলে বিয়েটা নাকচ করে দিতে পারলেই নগদ একশ' টাকা রোজগার। কানাই বললে, মাসী, একটা কথা তোকে, না না তোমাকে আমি বলি শোনো।

এই বলে খুব বিজ্ঞের মত কানাই ভাল করে চেপে বসলো। বললে, রিণির সঙ্গে কাকাবাবুর বিয়ে তুমি দিও না মাসী।

—কেন রে ?

—রিণি ভাল মেয়ে নয় মাসী।

—কে বললে ?

—আমি জানি মাসী, পাড়ার সবাইকারখবর আমি জানি। ওই যে সুন্দরদা আছে না, ফণীবাবুরছেলে—ও কেমন ছেলেজানো তো ?

মলিনা বললে, কি জানি বাবা, ফণীবাবু দেবতার মতন মানুষ, ও-ও তেমনি হবে।

—ঠিক তার উল্‌টো মাসী, ঠিক তার উল্‌টো। ওর একটা নাচের দল আছে, রিণি পয়সার লোভে সেই দলে নাম লিখিয়েছে। ওদের সঙ্গে নেচে নেচে বেড়াবে, মাসে হাজার টাকা রোজগার করবে। তারপর একদিন দেখবে, খ্যামটাউলির মতন ওই সুন্দরদার সঙ্গেই লট্‌কে পড়বে।

দুটো হাতের আঙুল দিয়ে এমন বিশ্রী ভঙ্গী করে লট্‌কে পড়ার ইঙ্গিতটা সে দেখালে যে মলিনার পা থেকে মাথা পর্যন্ত রী রী করে উঠলো। বললে, যা যা তুই ওঠ্‌ দেখি এখান থেকে। ঘুমোগে যা। আর বক্ বক্‌ করে বকতে হবে না।

এই বলে কানাইকে একরকম জোর করেই তুলে দিলে মলিনা।

ওদিকে পান্নালালের হ'লো আরও মুস্কিল। সুন্দরের কথাটা করালীকে বলতে পারলে না ভয়ে, তাই সে বিনয়কে বলবার চেষ্টা করলে। কথাটা শুনে বিনয় রেগে একেবারে টং। বললে, ছি ছি

ছি ছি! ফণীবাবুকে দেখলে তার পায়ের ধুলো নিতে ইচ্ছে করে, আর ওই তার ছেলে! ওকে আর কোনোদিন এখানে যদি আসতে দেখি তো আমি কিছু বাকি রাখবো না বলে দিচ্ছি। নাচগানের কথা কোনোদিন যদি বলে তো ওকে আমি মেরেই বসবো।

পান্নালাল বললে, তা মারবে বই-কি! মাসে একটি হাজার টাকা—কোনোদিন ভাবতে পেরেছো?

—ভাবতে আমি চাই না।

—তা চাইবে কেন? পান্নালাল বললে, দুবেলা হাঁড়ি চড়বে না, বাড়ীভাড়া দিতে পারবে না, ছেঁড়া কাপড় পরে রাস্তায় বেরুতে পারবে না, আপিসে আপিসে ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াবে।

—কি করবো। বিনয় বললে, কি করবো বলতে পারেন? দেশের অবস্থা এরকম হয়েছে—হাজার হাজার বি-এ এম-এ পাশ-করা ছেলে বেকার ঘুরে মরছে। তবে এমন অবস্থা চিরদিন থাকবে না। ব্যবস্থা একটা হবেই।

—হবে, না হলেই নয়! সেই আশাতেই থাকো। পান্নালাল রাগ করে বললে, এখন না খেয়ে উপোস দিয়ে মর, আর যে তোমার উপকার করতে চাইবে তাকে খুন করে এসোগে যাও! এই ছাখো!

বলে তার ফতুয়ার পকেট থেকে পঁচাত্তর টাকার নোটগুলি বের করে বললে, তোমাদের তিন মাসের ভাড়ার টাকা সব মিটিয়ে দিয়েছে।

বিনয় যেন দপ্ করে জ্বলে উঠলো। বললে, আপনি নিলেন? নিতে পারলেন? আমাকে আপনি কোথায় নামিয়ে দিলেন বলতে পারেন? আজ রিণিকে সে নাচগানের কথা বলেছে, কাল এমন কথা বলবে যা শুনলে মনে হবে ওকে খুন করে আসি। না না, এ টাকা আপনি নিতে পারবেন না।

নিতে পারবেন না শুনেই নোটগুলো পান্নালাল তাড়াতাড়ি পকেটে রাখতে যাচ্ছিল, বিনয় খপ্ করে নোটগুলো তার হাত

থেকে কেড়ে নিয়ে ছুটলো। ছুটলো বোধকরি সুন্দরকে ফিরিয়ে দেবার জন্যে।

পান্নালালও ছাড়বার ছেলে নয়। সেও ছুটলো তার পিছু-পিছু 'বিনয়' 'বিনয়' বলে চেঁচাতে চেঁচাতে।

পান্নালাল ভেবেছিল যাক্ না, সুন্দরের দেখা পাবে না। কিন্তু এমনি মজা, ঠিক সেই সময়েই সুন্দর বোধকরি বাড়ী থেকে বেরুচ্ছিল, দুজনের একেবারে মুখোমুখি দেখা।

বিনয় ভেবেছিল অনেক-কিছু বলবে তাকে, কিন্তু মুখে তার কথা যেন আটকে গেল। নোটগুলো দলা পাকিয়ে সুন্দরের মুখের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে বললে, আমি গরীব হতে পারি কিন্তু ভিক্ষুক নই।

বলেই সে আর সেখানে না দাঁড়িয়ে হন্ হন্ করে বাড়ীর দিকে ফিরে এলো।

পান্নালাল তাড়াতাড়ি কুড়োতে বসে গেল নোটগুলো। কুড়োতে কুড়োতে বললে, কাজকর্ম কিছু না পেয়ে ছোঁড়াটার মাথাটা গেছে খারাপ হয়ে। তুমি কিছু ভেবো না সুন্দর, আমি সব ঠিক করে দেবো।

মাসীকে সেদিন মুড়ি, খেতে দেখে কানাই সত্যিই বিচলিত হয়েছে মনে হলো।

শিউলিতলা লেনের বাইরে একটা গলি রাস্তার মোড়ে কাঞ্চনের চায়ের দোকানটা তখন বেশ জমে উঠেছে। পাড়ার ছেলেদের আড্ডা বলতে ওই চায়ের দোকানটি। বিনয় এইখানেই চা খায়, পরেশও খায়।

কানাই ভাব করতে বাহাদুর। প্রায়ই সে এই দোকানটিতে গিয়ে বসে। বসে যে শুধু চা খাবার জন্যে তা নয়। উদ্দেশ্য মহৎ। সেদিন চা খেতে খেতে দোকানের মালিক কাঞ্চনের মাথায় হঠাৎ একটি পাকা চুল দেখতে পেয়ে কানাই লাফিয়ে উঠলো। তাড়াতাড়ি

কাঞ্চনের কাছে গিয়ে তার মাথা থেকে পাকা চুলটি তুলে দিয়ে বললে, এরই মধ্যে তোমার মাথার চুল কেমন ক'রে পাকলো কেঁচো-দা ?

—ভাল ভাল গন্ধ তেল মেখে মেখে। প্রসন্ন দৃষ্টিতে কানাইএর দিকে তাকিয়ে কেঁচোদা বললে, আমার বয়েস কত বল্ দেখি ?

কানাই তৎক্ষণাৎ বলেছিল, তিরিশ বত্রিশ।

কাঞ্চন বলেছিল, না। বিয়াল্লিশ।

কানাই অবাক হয়ে গেল। অবাক হলে মানুষের চোখ বড় হয়ে ওঠে, কিন্তু কানাইএর সবই বিচিত্র। কানা চোখটি তার ছোট। দ্বিতীয় চোখটিও তেমনি ছোট হয়ে গেল।

কানাই কিছুতেই বিশ্বাস করলে না। বললে, ধেৎ তুমি মিছে কথা বলছো। বিয়াল্লিশ ? কোন্ শালা বলে ? বিয়াল্লিশে এই রকম চেহারা থাকে কখনও ?

কাঞ্চন আরও খুশী হলো ; গম্ভীর হয়ে বললে, হেঁ-হেঁ রাখতে হয়। রাখতে জানা চাই।

এমনি করেই কাঞ্চনের সঙ্গে কানাই-এর প্রথম পরিচয়। তার পরই দেখা গেল, পরিচয় আরও ঘনিষ্ঠ হয়েছে। কানাই চা খেয়ে দাম দিতে গেল, কাঞ্চন নিলে না। বললে, থাক্ আর এক-আধ কাপ চায়ের দাম দিতে হবে না তোকে।

কানাই কিন্তু সেকথা শুনলে না কিছুতেই।—না কেঁচোদা, এটা তোমার ব্যবসা। এই বলে কাঞ্চনের হাতটি চেপে ধরে চায়ের দাম চারটি পয়সা কানাই কাঠের বাক্সটিতে জোর করে ঢুকিয়ে দিলে।

চায়ের দোকানে সকাল বিকেল, দুবেলা যাওয়া-আসা চলছে কানাই-এর। বিকেলে সেদিন চায়ের দোকানের একটি ছোকরা জিজ্ঞাসা করলে, চা দেবো কানাইকে ?

কানাই বললে, না বাবা এখানে চা আমি খাব না। কেঁচোদা পয়সা নিতে চায় না।—তুই কি ভেবেছিস আমি চা খেতে এসেছি?

ছোঁড়াটা বললে, তাহ'লে কি জন্যে এসেছ?

কানাই বললে, আমি যে-জন্যেই আসি, তোর কি? এ-ছোঁড়াটা আচ্ছা ফাজিল তো?

কাঞ্চন ধমকে দিলে ছেলেটাকে, এই হেবো, তুই যা করছিস্ কর।

কানাই কাঞ্চনের আরও কাছে এগিয়ে এলো। বললে, মাসী আজ আমাকে খুব বকেছে কেঁচোদা।

—কেন?

—ওই যে গো পরেশ বাবু তোমার দোকানে যার বারো আনা ধার—উনি গিয়ে লাগিয়েছেন মাসীকে। মাসী আমাকে বলছিল, একটি পয়সা রোজগার করবার ক্ষমতা নেই হতভাগা, আর শুনছি নাকি চায়ের দোকানে গিয়ে দিনরাত আড্ডা মারিস! পট্ ক'রে একটা মিছে কথা বলে দিলাম মাসীকে। বললাম, কেঁচোদা আমাকে একটা চাকরি দেবে বলেছে। রোজ একটাকা ক'রে মাইনে। এই না শুনে মাসী চুপ করলে। নইলে লোহার এত বড় একটা সাঁড়াশী তুলেছিল আমার মাথার ওপরে। দিতো যদি বসিয়ে তো বাস, কেঁচোদার সঙ্গে গল্প করা আমার বেরিয়ে যেতো।

কাঞ্চন কি যেন ভাবলে। বললে, চাকরি করবি কানাই?

—কিসের চাকরি?

—আমার কাছে আর কিসের চাকরি আছে বল্। এই খদ্দেরদের চা দেবার চাকরি।

—কানাই চট্ করে হাত বাড়িয়ে কাঞ্চনের পায়ের ধূলো মাথায় নিয়ে উঠে চলে গেল দোকান থেকে।

কাঞ্চন বললে, কি রে, পালাচ্ছিস যে? জবাব দিলি না?

জবাব দেওয়া দূরে থাক্, কানাই ফিরেও তাকালে না। কাঞ্চন

ভাবলে চায়ের দোকানের চাকরের কাজ, সত্যিই তো কানাইকে বলা বোধহয় তার উচিত হলো না।

কিন্তু মিনিট পনেরো পরেই ফিরে এলো কানাই। এসেই বসলো কাঞ্চনের পাশটিতে।

কাঞ্চন বললে, ও-কাজের কথাটা তোকে বলা আমার উচিত হয়নি কানাই, কিছু মনে করিস না।

ধরা-ধরা গলায় কানাই বললে, হ্যাঁ, তা বলবে বই-কি! আমি কেন চলে গেলাম জানো কেঁচোদা?

—কেন?

—কথাটা শুনে আনন্দে চোখে আমার জল এসে গিয়েছিল। আমি জানি কেঁচোদা ছাড়া আমাকে এত ভালবাসবার লোক আর কেউ নেই। এক তুমি ছাড়া আমি এই পিথিবীর সবাইকার দু'চক্ষের বিষ। এই বলে কানাই তার ছেঁড়া কাপড়ের খুঁটটা একবার তার চোখের কাছে তুলে চোখ দুটো মুছে নিলে। বললে, কাল থেকে আমি কাজে লেগে যাব কেঁচোদা। আজ আমি আর বসতে পারছি না। আমি চললাম।

কাঞ্চন তার হাতটা চেপে ধরে বললে, চা খেয়ে যা!

কানাই বললে, দেবে তো দাও এক কাপ।

চায়ের দোকানে কানাইএর চাকরি হয়ে গেছে। মাইনে তিরিশ টাকা। সেদিন বোধহয় সে দোকানেই যাচ্ছিল, পেছন থেকে পরেশ হঠাৎ তার মাথায় এক চাঁটি মেরে দিয়ে বললে, এই কানা!

আচম্‌কা মার খেয়ে কানাই চম্‌কে উঠে থম্‌কে দাঁড়ালো। বললে, কে?

পেছন ফিরে পরেশকে দেখেই বললে, খবরদার বলছি—মাথায় মেরো না। মাথায় ঠাকুর থাকে। দাও, ফুঁ দিয়ে দাও।

পরেশ বললে, অপরাধ হয়ে গেছে বাবা!

বলেই তার মাথায় একটা ফুঁ দিয়ে বললে, হলো তো?

কানাই বললে, এই বুঝি তোমার ফুঁ দেওয়া হলো? জোরে জোরে দাও।

—জোরে জোরে? আচ্ছা তাই দিচ্ছি। বলে বেশ করে দম নিয়ে খুব জোরে একটা ফুঁ দিয়ে পরেশ বললে, ফুঁয়ের চোটে তোর মাথার ঠাকুর-টাকুর সব গেল উড়ে।

কানাই তখন তাকে ধরে বসলো, তুমি আমাকে কানা বললে কেন?

—কানাই বলে ডাকলে যে সাড়া দাওনা চাঁদ, কানা বলে ডাকলে ফিরে দাঁড়াও। পরেশ হাত বাড়িয়ে কানাইকে জড়িয়ে ধরে বললে, বেশ আর কানা বলবো না, ভালবেসে এক-আধটা চড়-চাপড় মারি, তাও না-হয় মারবো না। তুই শুধু চুপি-চুপি আমাকে বলে যা—সুন্দর সেদিন তোকে টেনে নিয়ে গিয়ে কি বললে?

কানাই বললে, ওরে বাবা, সে অনেক কথা। পরে বলবো, এখন আমার তাড়াতাড়ি আছে, আমাকে ছেড়ে দাও।

—তোর আবার তাড়াতাড়ি কিসের? আপিসে চাকরি করিস নাকি?

চায়ের দোকানে তার চাকরির কথাটা পরেশ জানতো না। জানবেই-বা কেমন করে? বারো আনা পয়সার ভয়ে পরেশ আর ও রাস্তা মাড়ায় না।

কানাই বললে, কেঁচোদার চায়ের দোকানে আমি চাকরি নিয়েছি। তিরিশ টাকা আগাম দেবে বলেছে, এখন যদি না যাই তো দেবে বুড়ো-আঙুল দেখিয়ে। তখন কি হবে জানো?

—কি হবে?

—কাল তোমাদের র‍্যাশন্ আসবে না। ছাড়ো, যাই।

পরেশ কিন্তু যেতে তাকে দিলে না। জোর করে কানাইকে চেপে ধরে বললে, না, তোকে বলতেই হবে।

—না শুনে ছাড়বে না দেখছি।

কানাই বললে, সুন্দরদা শুনতে পেলে কিন্তু আমার টাকা মারা যাবে। কেউ যেন না জানে। আমি তোমাকে বলছি।

—না না জানবে না, তুই বল।

—কথাটা খুব খারাপ কিন্তু। বলেছে, শুনছি নাকি রিণির সঙ্গে পরেশের বিয়ে হবে? বললাম, আমি জানি না। বললে, তুই কি জানিস ছাই! রিণি যে খুব খারাপ মেয়ে তা জানিস? রিণি হচ্ছে গিয়ে খ্যামটাউলি। আমি যে কোম্পানী করেছি, সেই কোম্পানীতে রিণি চাকরি করবে, নাচবে, গান গাইবে, মাইনে পাবে। এই সব কথা তোর মাসীকে বলে বিয়েটা যদি ভাঙ্গিয়ে দিতে পারিস তো তোকে নগদ একশ' টাকা দেবো।

পরেশ, বললে, দেবে একশ' টাকা, না দিলেই নয়!

কানাই বললে, পঞ্চাশ, পঁচিশ, যা-দেয় দেবে।

—তাহলে রিণির নামে এই সব কথা বলবি তোর মাসীকে?

কানাই বললে, বলবো মানে? যেমন করে হোক, আমার চাই টাকা। টাকা না পেলে কি হবে জানো? খবর-টবর তো রাখো না কিছু, চাকরির দরখাস্ত লিখছো খচ্ খচ্ করে আর ফুর্তি মারছো।

পরেশ ধমকে দিলে, ফের ওই কথা! কি খবর রাখতে হবে চাঁদ?

কানাই বললে, মাসী কি খায় জানো? আমাদের ভাত খাইয়ে মাসী এই এতক'টি মুড়ি খেয়ে থাকে। অমনি শুকনো মুড়ি খেয়ে আর কদ্দিন! আমার মা যেমন না খেয়ে মরে গেল, মাসীও ঠিক তেমনি মরে যাবে দেখো।

কথাগুলো শুনে পরেশের হাতটা শিথিল হয়ে গেল। রাস্তার দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবতে লাগলো সে।

কানাই বললে, এই ছাখো, তুমি দিলে দেরি করে। টাকা না পেলে—

—আমি তো তোকে ছেড়ে দিয়েছি, যা না!

এই বলে একটা চড় মেরে দিয়ে পরেশ সরে দাঁড়ালো। চড়টা এবার তার মাথায় মারলে না, মারলে গায়ে।

কানাই বললে, ও বাবা, কথাটা জেনে নিয়ে এখন চোখ রাঙাচ্ছো? এই বলে সে একটুখানি দূরে পরেশের নাগালের বাইরে চলে গিয়ে পেছন ফিরে বললে, রিণি যে খ্যাম্‌টাউলি সে কথা মাসীকে বলে দিয়েছি। বলেই সে ছুটে পালিয়ে গেল।

পরেশ সেদিকে একবার ফিরেও তাকালে না। আমাদের ভাত খাইয়ে বৌদি মুড়ি খেয়ে থাকে। এই কথাটাই সে ভাবতে লাগলো—কানাই এর মত ছেলেও মাসে তিরিশ টাকা রোজগার করবে, আর সে নিজে? বি-এ পাশ করে বসে আছে, একটি পয়সাও সংসারে দিতে পারছে না। তার দাদা বৃথাই ঘুরে মরছে চাকরির চেষ্টায়।

সেদিন দেখা গেল, করালী তার ছাত থেকে 'দিদি' 'দিদি' বলে চেঁচাচ্ছে।

ডাক শুনে মলিনা ঘর থেকে বেরিয়ে এলো।

—কিরে, আমাকে ডাকছিস?

—হ্যাঁ দিদি, তোমাকেই ডাকছি।

—কি বলছিস?

করালী বললে, আচ্ছা দিদি, আমরাই না হয় মাঝে মাঝে মিথ্যে কথা বলি, কিন্তু তুমি কি বলে সেদিন অমন জলজ্যান্ত মিছে কথাটা বললে?

সর্বনাশ! মিথ্যে বলার অপবাদ মলিনাকে আজ পর্যন্ত কেউ দেয়নি, মেয়েটা বলে কি? মলিনা বললে, আমি? মিছে কথা বলেছি?

—হ্যাঁ হ্যাঁ বলেছো।

—কি বলেছি বল।

—কেন বলবো? করালী তার অভ্যস্ত 'হাসি হেসে বললে, তুমি নিজেই মনে করে ত্যাখো।

মলিনা বললে, আমার মনে পড়ছে না। তুই বল্।

করালী জিজ্ঞাসা করলে, দেওরটি কোথায়? দেবর লক্ষ্মণ?

—আছে এইখানে কোথাও, নয়ত বেরিয়েছে চাকরির খোঁজে।

করালী বললে, বলেছিলে কত্তাটিকে?

—কি বলবো?

করালী বললে, রিণির সঙ্গে নীচের ঠাকুরপোর বিয়ের কথা।

মলিনার কিন্তু মনটা তখনও খচ্ খচ্ করছে। বললে, তুই বল্ আগে মিছে কথাটা কি বলেছি—

করালী কিন্তু সেটাকে তেমন আমলই দিলে না। বললে, সে আর এমন কি কথা! বলছি, বলছি। তুমি বল না বিয়ের কথাটা শুনে কত্তাটি কি বললেন?

মলিনা বললে, ঠাকুরপো কাজকর্ম একটা কিছু পেলেই বিয়ে দেবে বললে। নে বল্ এবার মিছে কথাটা কি আমি বলেছি তোকে।

করালী বললে, তোমার সেই কানা চাকরটি গেল কোথায়?

—গেছে হয়ত কারও ফরমাস খাটতে।

করালী বললে, ওরই কথা বলছিলাম।

মলিনা বললে, যাঃ, কি যাতা বলছিস! মিছে কথাটা কি—তাই বল্ আগে।

করালী বললে, তোমার ওই যে দিদি মারা গেল কানাই তো তারই ছেলে। তোমার আপন বোন-পো। আর তুমি সেদিন বললে কিনা কানাই চাকর।

মলিনার মনের ভেতর খিচ্ একটা বেধে রইলো, তবু সে মুখে হাসি টেনে এনে বললে, ও এই কথা! তা ও চাকর নয় তো কি? তুই চাকর বললি কিনা, আমিও তাই হাসি রহস্য করে বললাম সেদিন। কিন্তু কে তোকে বললে? এ-কথা কোথায় শুনলি?

করালী বললে, সে তোমার শুনে কাজ নেই।

বলেই সে হাসতে হাসতে সরে পড়লো।

কেঁচো কুণ্ডুর চায়ের দোকানে কানাই এলো সেদিন একটু দেরী করে। কেঁচো বললে, এত দেরী করে এলি কানাই ?

কানাই বললে, কাল থেকে দেখে নিও তুমি—তোমার আগে এসে বসে থাকবো।

দু'চারটে খদ্দের বিদায় করে, দু' একজনকে চা দিয়ে কানাই ধীরে ধীরে এসে দাঁড়ালো কেঁচোর কাছে। ডাকলে, বড়দা। বড়দা।

কেঁচো খাতায় হিসেব লিখছিল, মুখ তুলে তাকাতেই কানাই বললে, তাহ'লে সেই অগ্রিম যে তিরিশটে টাকা দেবে বলেছিলে, দাও। দিয়ে আসি মাসীকে। এসেই কাজে লেগে যাই।

বলেই হাত বাড়িয়ে কেঁচোর মাথা থেকে পট্ করে একটি পাকা চুল তুলে কেঁচোর চোখের কাছে তুলেধরে বললে, নাও, পাকা চুল।

কেঁচো বললে, দামী দামী গন্ধ তেলগুলো মেখে মেখে আমার এইটি হলো। এরই মধ্যে চুলে পাক ধরে গেল। একদিন দিস তো কানাই বেছে বেছে একটি একটি করে তুলে।

কানাই বললে, বাছতে হবে না বড়দা। পটাপট্ পটাপট্ করে তুলে আমি একেবারে মাঠ করে ছেড়ে দেবো। দাও তাহ'লে টাকা ক'টা র‍্যাশানের দোকান বন্ধ হয়ে যাবে।

কেঁচো বললে, তিরিশ টাকাই দিতে হবে ? কিছু কম হ'লে চলবে না ?

—তাই চলে ? আচ্ছা তুমিই বল না বড়দা, মেসোমশাই-এর চাকরি নেই, আর ছোট মেসোটি তো জানোই, তোমার বারো আনা পয়সার ভয়ে এ-পথ মাড়াচ্ছে না। নিজের তালেই ঘুরছে, আমাকে কানা ছাড়া বলে না।

কেঁচো বললে, তুই তো কানাই, তোকে কানা বলে ডাকে,

তাতে আর হয়েছে কি? আমার গায়ের রং ছেলেবেলায় ছিল তপ্ত কাঞ্চনের মত, তাই মা আমার নাম রেখেছিল কাঞ্চন। এখন সেই কাঞ্চন হয়েছে কেঁচো। কেঁচো কুণ্ডু।

কিন্তু তপ্ত কাঞ্চন যে কেমন করে কালো আলকাতরা হতে পারে সে কথা বুঝা শক্ত। বুঝলেও কানাই-এর এখন কিছু বলা চলে না। কানাই বললে, তবেই ছাখো। বড়দা বাক্সটা খুলবো?

কেঁচো কি আর করবে, দিলে তিরিশটে টাকা। নোট সব হলো না, সিকিতে আধুলিতে দুআনিতে আনিতে মিলিয়ে টাকা তিরিশটি কানাই-এর হাতে দিয়ে বললে, ভাল করে গুণে ছাখ্।

কানাইএর তখন গোণবার অবসর ছিল না, সব কিছু জামার বুকের পকেটে পুরে নিয়ে ছুটলো!

ছুটলো তার মাসীমার কাছে।—মাসী! মাসী! কোথায় রয়েছ তুমি!

করালীর কথা শুনে মাসী তখন কানাইএর ওপর রেগে টং হয়ে আছে। আজ এই ছেলেটার জন্যই ছাত্তের বৌ করালী তাকে মিছে কথা বলার অপবাদ দিয়েছে—এত করে বারণ করা সত্ত্বেও কানাই শোনেনি।

মলিনা রান্না চড়িয়েছিল। তাড়াতাড়ি ঘটির জলে হাতটা ধুয়ে উঠে দাঁড়ালো। বললে, আয় তুই একবার। তোকে আমি দেখাচ্ছি মজা!

মাসী বলে কানাই ঘরে ঢুকতেই মলিনা এগিয়ে গিয়ে ঠাস্ করে তার গালে এক চড় মেরে বসলো। বললে, হতভাগা! বেরো তুই আমার বাড়ী থেকে। তোকে দয়া করে এখানে রাখাই আমার উচিত হয়নি!

কানাই কিছুই বুঝতে পারলে না। মার খেয়ে কেমন যেন

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়ে 'তুমি' বলবার কথা ভুলে গিয়ে বলে বসলো, কি হয়েছে বলবি তো।

মলিনা আরও রেগে গেল। এবার সে তার মাথায় গায়ে এলোপাথাড়ি চড় মারতে মারতে বলতে লাগলো, হয়েছে তোর মাথা আর মুণ্ডু। মা খেয়ে বাপ খেয়ে তুই আমার বাড়ীতে এসে কেন জুটলি বলতে পারিস? আমি যা বারণ করলাম তুই তাই করলি? আমার দুঃখের সংসার—কোন রকমে দুখের ভাত সুখ করে খাই—আমরা তিনটি প্রাণী—একধারে পড়ে থাকি, কারও কোনও কথায় থাকি না, জীবনে কখনও মিথ্যে কথা বলিনি, আর আজ কিনা তোর জন্যে আমাকেও মিথ্যেবাদী হ'তে হলো? বেরো হতভাগা বেরো।

মারের ভয়ে কানাই তার হাত দুটো মাথার ওপর তুলে পিছু হাঁটছিল। পেছনের দেয়ালে ছিল কাঠের তাক। কানাই সেই তাকে গিয়ে ধাক্কা খেলে। ধাক্কা খেতেই তাক থেকে ঝন্ ঝন্ করে একটা কাপ ডিস পড়ে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল আর ভারি লোহার হামানদিস্তাটা পড়লো কানাইএর পায়ের ওপর।

উঃ মাগো! বলে কানাই চীৎকার করে উঠলো। আর যেই সে চীৎকার করে মাথা নীচু করেছে, অমনি ঘটে গেল আর এক বিপর্যয়। কানাইএর জামার বুকের পকেট থেকে তিরিশ টাকার খুচরো রেজ্‌কি ঘরের ভেতর ছড়িয়ে পড়ে একেবারে ছই ছত্রাকার হয়ে গেল। তাই না দেখে মলিনা চেঁচিয়ে উঠলো, তবে রে হতভাগা, পাড়া শুদ্ধ লোকের বাজার করিস, সেদিন জিজ্ঞেস করলাম তো বললি চুরি আমি করি না। রোজ চুরি করে করে এতগুলো টাকা জমিয়েছিস হতভাগা, তোর জন্যে আমার বদনামের কিছু বাকি রইলো না। এই কথা যদি তোর মেসোর কানে ওঠে তো আমাকে গলায় দড়ি দিয়ে মরতে হবে।

কানাইএর পা'টা বোধ হয় কেটে গেছে। চোখ দিয়ে তার দর

দর করে জল গড়াচ্ছে আর বলছে, চুরি আমি করিনি মাসী, চুরি আমি করিনি।

মলিনা বললে, এখনও বলছিস চুরি করিসনি? চুরি করিসনি তো এই এতগুলো টাকা পেলি কোথায় রে মুখপোড়া? এ-সব এলো কি তোর বাপের জমিদারী থেকে?

টাকা পয়সাগুলো মলিনা কুড়োতে লাগলো—এই তো পাঁচ টাকার নোট একখানা, এই তো দু'টাকা—সাত, আট, নয়, দশ--

তারপর আর গুণতে পারলে না। সিকি দুআনি যেখানে যা পড়েছিল ঝাঁটা দিয়ে সব একজায়গায় জড়ো করে ঘরের মেঝেয় নামিয়ে গুণে দেখলে, তিরিশ টাকা হলো। এই তিরিশ টাকা, না আরও আছে?

কানাই মুখ তুলে বললে, না আর নেই।

ঠোঁট দুটো তার থর থর করে কাঁপতে লাগলো। চোখ দিয়ে আবার দর দর করে জল গড়িয়ে এলো। খানিকটা সামলে নিয়ে কানাই তার দাঁত দিয়ে ঠোঁটটা চেপে বললে, আমি চুরি করিনি মাসী।

বলেই সে উঠে দাঁড়ালো। পায়ের যে-জায়গাটা সে হাত দিয়ে চেপে ছিল সেখান থেকে হাতটা তুলে নিতেই গল্ গল্ করে খানিকটা কাঁচা রক্ত গড়িয়ে এলো। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে সে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

মলিনা দাঁড়িয়ে রইলো হাতের মুঠোর ভেতর টাকাপয়সাগুলো নিয়ে। কানাইয়ের পায়ের ছাপ পড়েছে ঘরের মেঝের ওপর। রক্তের ছাপ। সেইদিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কি জানি কেন তারও চোখদুটো জলে ভরে এলো।

ওদিকে উনোনে যে তরকারি চড়িয়েছিল সেকথা সে ভুলেই গেছে। পোড়া গন্ধ উঠতেই মনে পড়লো। টাকাপয়সাগুলো তাড়াতাড়ি আঁচলের খুঁটে গেরো দিয়ে বেঁধে মলিনা ছুটে গেল উনোনের কাছে। কড়াইএ তখন ধোঁয়া উঠছে। ঘটির জলটা

চড়াইএর উপর ঢেলে দিয়ে পিড়িটা টেনে নিয়ে মলিনা ভাবতে বসলো—টাকা ও পেলে কোথায়?

করালী আবার ডাকছে, দিদি! দিদি!

ডাকবার একটা সময়-অসময় নেই।

ডাকুক্‌গে যাক্‌! শুনেও শুনেলে না মলিনা। সাড়া দিলে না। করালী কিন্তু ডাকতেই লাগলো।—দিদি! বলি ও নীচের দিদি! সাড়া দিচ্ছ না কেন? আমার ওপর রাগ করলে নাকি?

পরেশ এসে ঢুকলো বাড়ীতে।—কি বলছো ছাতের বৌদি?

করালী বললে, ছাখো তো ভাই নীচের দিদি কোথায় রয়েছে, সাড়া দিচ্ছে না কেন? তোমার দাদা রয়েছেন নাকি বাড়ীতে?

পরেশ বললে, কই না তো।

করালী বললে, তাহলে দিদি বোধহয় আমার ওপর রাগ করেছে।

—ধেৎ! বৌদি কখনও রাগ করে না। পরেশ জিজ্ঞাসা করলে, রাগ করবার মত কিছু বলেছ নাকি?

করালী বললে, তোমাকে সেদিন জিজ্ঞাসা করলাম তো কানাই এর কথা, বললে, কানাই চাকর কেন হবে, বৌদির দিদির ছেলে। সেই কথাটা বলেছিলাম দিদিকে।

পরেশ হো হো করে হেসে উঠলো। বললে, তোমার মাথায় পাগলামির একটু ছিট্ আছে' বৌদি। আচ্ছা এর জন্যে মানুষ কখনও রাগ করে? বল—কি বলতে হবে বৌদিকে আমি বলছি।

—নাথাক,তোমাকে,বলতেহবে না। যা বলবার আমিই বলবো।

এই কথা বলেই করালী হাসতে হাসতে আবার বললে, এই ছাখো ঠাকুরপো কে উঁকি মারছে। কিছু বলবি তো বল্‌না!

রিণি একবার তার মাথাটা তুলে মুচকি হেসে সরে গেল সেখান থেকে। করালীও চলে গেল তার পিছুপিছু।

—বৌদি! বৌদি! পরেশ ঢুকলো রান্নাঘরে। বললে, ছাতের বৌদি কি বলছিল শুনলে?

মলিনা বললে, শুনলাম।

পরেশ বললে, ছাতের বৌদি কানাইকে ভেবেছিল চাক আমিই ওর ভুলটা দিলাম ভেঙ্গে। বললাম, কানাই চাকর ন বৌদির আপন বোন-পো। চাকর-বাকর বোলো না ওকে, বৌ মনে কষ্ট পাবে। তাই ভেবেছে বুঝি তুমি রাগ করেছ।

মলিনা একটি কথাও বললে না। চুপ করে আপন মনেই কা করতে লাগল।

পরেশ কিন্তু তখনও থামলো না। বললে, তা কানাইকে চাক নয় বললে কি হবে বৌদি, ঘুরেফিরে চাকর সে হবেই। আমাদে রাস্তার ওই মোড়ে একটা চায়ের দোকান আছে—জানো বৌদি সেইখানে যে চাকরগুলো খদ্দেরদের চা দেয়, ছত্রিশ জাতের এঁটো কাটা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করে, কানাই আজ সকালে বলছিল— নাকি সেই চাকরের কাজ একটা নিয়েছে। কানাইএর হাতটা চেপে ধরেছিলাম, জোর করে হাতটা সে ছাড়িয়ে নিয়ে বললে, ছাড়ো ওখান থেকে তিরিশটা টাকা আনতে যাচ্ছি, আগাম দেবে বলেছে।

এই বলে হো হো করে হাসতে হাসতে বললে, আবার পাকা পাকা কথা কি-রকম। বলে কিনা মাসী মুড়ি খেয়ে থাকে। ওকি? তুমি—

হঠাৎ মলিনার দিকে চোখ পড়তেই দেখলে, মলিনা কাঁদছে। দু'চোখ বেয়ে জল গড়াচ্ছে, আর দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁটটা জোর করে চেপে রয়েছে।

—এতে কাঁদবার কি হলো বৌদি? ও, বুঝেছি। বামুনের ছেলে হয়ে—আচ্ছা দাঁড়াও আমি দোকানদারকে বারণ করে দেবো। আবার ছাখো, আগাগোড়া গুল্ মেরেছে কিনা, হয়ত সব মিছে কথা বললে।

মলিনা এতক্ষণে কথা বললে।—না ঠাকুরপো, মিছে নয়, সব সত্যি। এই ছাখো তিরিশটে টাকা এখনও আমার খুঁটে বাঁধা।

আর এই জন্যে ওকে আজ আমি মেরে শেষ করে দিলাম। একবার ছাখো তো ঠাকুরপো হতভাগা কোথায় গেল।

—দেখি। বলে পরেশ বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

সুন্দর বেরুচ্ছিল, পেছন থেকে ডাক শুনে থমকে দাঁড়ালো। দেখলে, পরেশ সেই দিকে এগিয়ে আসছে। পরেশ আর সুন্দরের বয়স প্রায় এক, তবে চেহারা দেখে মনে হয় পরেশই যেন ছু'এক বছরের বড়। তবু সে সুন্দরের কাছে এসে বললে, সুন্দরদা! তোমার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে। দাদা সে সুন্দরকে কোনদিনই বলে না। আজ সে দাদা কেন বললে কে জানে।

সুন্দর বললে, Good morning! কিন্তু আমি তোমার •দাদা কবে থেকে হলাম? I am not your দাদা।

পরেশ বললে, Yes, you are. Only because you are rich. All rich men are দাদা to me। যাক্‌গে, কেমন চলছে তোমার কাজকর্ম?

সুন্দর বললে, good.

পরেশ বললে, আমাকে একটা কাজটাজ দাও না তোমাদের কোম্পানীতে।

সুন্দর বললে, কাজ? what কাজ?

—যে কোন কাজ। মানে কিছু রোজগার হলেই হলো।

সুন্দর জিজ্ঞাসা করলে, why? for your nest expenses?

—তার মানে? পরেশ জানে সুন্দরের এই ইংরেজি বুক্‌নির কথা। তবু একটু মজা করবার জন্যেই বোধকরি না বুঝবার ভান করলে।

সুন্দর বললে, তুমি বি-এ পাশ করেছ, আর আমি ম্যাট্রিকুলেশন ফেল করেছি ছুবার। ইংরেজি বোঝ না?

পরেশ বললে, তুমি অনবরত বলে বলে অভ্যেস করেছ আর

আমার অভ্যেস নেই একেবারে। একসাহেবের আপিসেগিয়েছিলাম সেদিন চাকরির খোঁজে। ইংরেজি বুঝতে না পেরে ফিরে এলাম।

সুন্দর বললে, wanting cultivation. Cultivation না থাকলে ইংরেজি understanding is very hard। আমি বলছিলাম your nest expenses মানে বাসা খরচ is not going very goodly, এই তো ?

পরেশের মনে হয় সুন্দরের মাথার একটু গোলমাল আছে। তা নইলে এরকম ইংরেজি সে বলে কেমন করে ? হয় তার মাথার গোলমাল আছে, নয়তো লোককে হাসাবার জন্যে সে ইচ্ছে করে বলে। পরেশ বললে, তুমি ঠিক ধরেছ তো।

সুন্দর বললে, কিন্তু ছাখো, আমাদের কোম্পানী হলো গিয়ে নাচগানের কোম্পানী। নাম Master Entertainers। আমরা কি করি জানো ? young beautiful ম্যাডামদের নিয়ে শো দেখিয়ে বেড়াই town into town, village into village। আজকাল লোকজনের দুঃখ কষ্ট খুব বেশি, তাই তাদের মনে we try to give happyness, but you are a he-man, you are not madam, you cannot do dancing, কাজেই no work for you sir.

পরেশ দেখলে গতিক ভাল নয়। তখন সে ঠিক তারই মত ইংরেজিতে তাকে বুঝাবার চেষ্টা করতে লাগলো। বললে, কিন্তু I can drive your company. মানে তোমার কোম্পানী আমি চালাতে পারি, ম্যানেজ করতে পারি, ম্যানেজার হতে পারি। তারপর ধরো এই পুজোর নবমীর দিনে ওই বস্তির মাঠে থিয়েটার হবে সেই থিয়েটারে আমি acting করবো। I can do acting.

সুন্দর বললে, We have no work with acting, আচ্ছা শোন। Hear me. On the way এরকম standingly standingly talking is not good, তার চেয়ে you come into my office one day.

পরেশ বললে, কিন্তু তোমার ঠিকানা মানে address তো আমি জানি না।

সুন্দর বললে, Take writing, লিখে নাও।

বলে তার পকেট থেকে Master Entertainers কোম্পানীর একখানি চিঠির কাগজ বের করে তার মাথার দিকটা ছিঁড়ে পরেশের হাতে দিলে। বললে, This has our address.

পরেশ বললে, thank you.

সুন্দর বললে, ভেবেছিলাম পুজোতেই we shall·be outing with the dancing party কিন্তু হলো না। পুজোর পর তুমি এসো। তোমার সঙ্গে একটা private consulting আছে। Good by.

সুন্দর চলে গেল। চলে গেল সোজা তার আপিসে। গিয়েই বিজনকে বললে, very good একটা engagement করে এলাম।

বিজন জিজ্ঞাসা করলে, কিসের engagement? বাংলায় বল্, তোর ইংরেজী আমি বুঝতে পারি না।

সুন্দর দমবার ছেলে নয়। বললে, বুঝবে কেমন করে? cultivation তো নেই। পরেশের সঙ্গে ব্যবস্থা করে ফেললাম। পরেশকে চিনিস তো?

—হ্যাঁ হ্যাঁ চিনি। যার সঙ্গে রিণির বিয়ের কথা হচ্ছে।

—That's alright, সেই পরেশ। সে আমার কাছে এসেছিল চাকরি চাইতে। আমি বললাম, come into my office.

বিজন বললে, পরেশ আপিসে এলেই তোর কার্যোদ্ধার হয়ে যাবে?

—হবে না? একটা চাকরির জন্যে he is always rounding and rounding into office after office.

—বাংলায় বল্।

সুন্দর বললে, ড্যাম ইওর বাংলা। আচ্ছা তাই বলছি। ওকে একটা monthly remunaration এর লোভ দেখাবো। বলবো come with your future wife তাকেও কাজ দেবো। তাহলে দুজনেই আসবে। তখন যা হয় ব্যবস্থা করা যাবে।

বিজন বললে, ছাখ্, আর যাই করিস, বোকার মতন কাজ করিস না। পরেশ কখনও রিণিকে নিয়ে এখানে আসবে না।

সুন্দর বললে, নিশ্চয় আসবে। ধর্ আমি রিণিকে বলেছিলাম হাজার টাকা মাইনের চাকরির কথা।

—হ্যাঁ বলেছিলি।

সুন্দর বললে, মনে মনে ওর ইচ্ছে ছিল sixteen annas, শুধু পান্নালালের বৌটা দিলে সব earth করে। আচ্ছা সে কথা ধর্ বলেছে পরেশকে।

বিজন বললে, তাও না হয় ধরলাম—বলেছে।

—তার পরেও পরেশের আমার কাছে আসা মানেই দুজনেই রাজী। বিনয় রাজীনয় কারণ বোনকে নাচাতে ও চায় না। বোনের income-এ দিন চলবে—he is shameful, কিন্তু পরেশ রাজী।

বিজন বললে, ও সব বাজে কথা রাখ্। বিনয় বা পরেশ দুজনের মধ্যে একজনও রাজী হবে না। ওদের বাদ দে। রিণির মত সুন্দরী যুবতী মেয়ে নাচ শিখেছে গান শিখেছে, তার ওপর টাকার অভাবে ভাল করে খেতে পরতে পাচ্ছে না, তুই যেমন করে পারিস, ছলে বলে কৌশলে রিণিকে একটিবার আমাদের এই আপিসে নিয়ে আয়, আমি ওর চোখের সামনে করকরে একটি হাজার টাকা নামিয়ে দিই, তারপর দেখি কেমন করে ও লোভ সামলায়। অনেক দেখেছি বাবা, ছেলেই বল আর মেয়েই বল টাকার কাছে মাথা নুইয়েছে সবাই।

সুন্দর বললে, Alright. তুই নগদ টাকাটা এনে রাখ্ আমি রিণিকে এনে দিচ্ছি।

কানাই তার পায়ে একটা ন্যাকড়া জড়িয়ে বসে আছে বাইরের ঘরে। পরেশ এত যে ডাকছে, কিছুতেই সাড়া দিচ্ছে না।

—কানাই! ও-বাবা কানাই!

কানাই চুপ্।

—'ব্লাইণ্ড' ছিলে, আবার 'লেম'ও হলে! মাসীমা নাহয় মেরেইছে দুটো চড়, তাই বলে অমনি রাগ করে বসে থাকে? নাও, মুখ ফেরাও বাবা, ভাল করে কথা বল।

কানাই তার হাতটা সরিয়ে দিয়ে বললে, না, আমি কারও সঙ্গে কথা বলবো না।

পরেশ বললে, কারও সঙ্গে কথা বলবে না? এ-বাড়ীতে আছে তো মাত্র তোমার মাসী আর মেসো, আর এই "মেসোর ভাই আর পিসের ভাই, যার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নাই"—কাজেই যা-কিছু বলছো সবই এই অধমকে লক্ষ্য করেই, সে কথা আমি বুঝতে পারছি কানাই।

কানাই এতক্ষণে কথা বললে, মার বোন মাসীর সঙ্গেই আমি কথা বললাম না, তুমি তো তুমি! মাসী আমাকে শুধু শুধু মেরে একেবারে তুলো ধুনে দিলে। তার ওপর বলে কিনা—আমার মন-মেজাজ ভাল নেই, কারও যদি খেতে ইচ্ছে হয় তো হেঁসেলে ভাত আছে, বেড়ে খাক্‌গে যাক্।

পরেশ বললে, তুই বুঝি তাই রাগ করে না খেয়ে বসে আছিস?

কানাই বললে, হ্যাঁ, আমি না খাবার ছেলে কিনা! হেঁসেল শেষ করে দিয়ে এসেছি। মাসী এইবার বুঝুক আমার সঙ্গে কথা না-বলার মজাটি। আমার কি, আমি তো চলেই যাব এখান থেকে।

মলিনা যে দোরের ফাঁকে চোখ রেখে দাঁড়িয়েছিল সে কথা এরা কেউ বুঝতে পারেনি। কানাই-এর চলে যাবার কথাটা শুনে সে বলে উঠলো, হ্যাঁ, তাই যা—চলেই যা তুই এখান থেকে। আমাকে

জ্বালাবার জন্যে এলি কেন হতভাগা ? সেইখানে থাকলেই তো পারতিস।

কানাই উঠে দাঁড়ালো মাসীর কথা শুনে। খুঁড়িয়ে খুড়িয়ে একটু এগিয়ে গিয়ে বললে, কাল তুমি মিছেমিছি আমাকে মারলে। ছাতের মাসীকে আমি শুধিয়েছিলাম ; সে কি বললে জানো ? বললে, নীচের ঠাকুরপো আমাকে বলেছে।

পরেশ চেঁচিয়ে উঠলো, কি বলেছি ?

কানাই বললে, বলেছ কানাই চাকর নয়, বৌদির আপন বোনপো।

—বলেছি তো। পরেশ বললে, ওরা তোকে চাকর মনে করে যখন তখন বাজারে পাঠায়, যা মুখে আসে তাই বলে, আমি বললাম, ওকে কি তোমরা চাকর ভেবেছো নাকি ? ছাতের বৌদি বললে, হ্যাঁ, চাকরই তো ! আমি বললাম, না ও চাকর নয়, বৌদির আপন বোনপো।

কানাই বললে, মাসী শোনো !

পরেশ বললে, এতেও কি আমার দোষ হলো বৌদি ?

মলিনা জবাব দিলে না। জবাব দিলে কানাই। বললে, হ্যাঁ হলোই ত।

—তুমি কি আমার সঙ্গে কথা বলবে না বৌদি ?

কানাই বলে উঠলো, কেন বলবে ? আমি হলাম মাসীর আপন বোনপো, আমারই সঙ্গে কথা বলছে না, তুমি তো তুমি !

এই বলে কি একটা কথা বলবার জন্যে সে তার মাসীর কাছে এগিয়ে গেল, কিন্তু মাসীর মুখের দিকে তাকিয়ে মুখের কথা তার মুখেই আটকে রইলো। তারও দুটো চোখ জলে ভরে এসেছিল। হাত দিয়ে চোখের জল মুছে আবার একটু এগিয়ে গিয়ে দেখে, মাসী চলে যাচ্ছে, তখন আর কথা না বলে পারলে না। ডাকলে, মাসী।

মলিনা কোন কথা না বলে ফিরে দাঁড়ালো শুধু।

কানাই বললে, আমি চলেই যাব মাসী। আমি কানা-খোঁড়া

মানুষ। আমি এখানে থাকলে তোমার লজ্জা হয় আমি বুঝতে পেরেছি।

কানাই-এর ঠোঁটদুটো থর্ থর্ করে কাঁপছিল, তাই বোধহয় একবার পেছন ফিরে চলে আসার চেষ্টা করলে, কিন্তু কি ভেবে আবার ফিরে দাঁড়িয়ে বললে, দুগগো-পুজোর সময় বস্তির মাঠে থিয়েটার হবে। থিয়েটার কখনও দেখিনি। ওই থিয়েটার দেখে বিজয়াদশমীর দিন তোমাকে বিজয়ার প্রণাম করেই আমি চলে যাব। আর আসব না।

এই বলে কানাই ফিরলো। চোখে ভাল দেখতে পায় না তাই সে দেখতে পেলে না তার মাসীর দু'চোখ বেয়ে তখন দরদর করে জল গড়াচ্ছে।

পুজো এসে গেছে।

সব চেয়ে মজা হয়েছে ঘড়িওলা বিশুর। ঘড়ি সারার কাজ আজকাল বন্ধ। অনেকরকম বাজি কিনে এনেছে বড়বাজার থেকে, রং মশাল, ফুলঝুরি, তুবড়ি, ছুঁচোবাজি, ধানী পটকা, শলতে পটকা, গাদ্দা-গুড়ুম, এ্যাটম-বোম—এমনি সব কতরকমের কত নাম। বিক্রি খুব। ছেলেরা দলে দলে আসছে, পয়সা ফেলছে আর কিনে নিয়ে যাচ্ছে। বিশুর আফশোস—দোকানটা এই শিউলিতলা লেনের ভেতর। এটা যদি এখানে না হয়ে বড় রাস্তার ধারে হতো, আর তার যদি একটা লাইসেন্স থাকতো, তাহ'লে বোধহয় এক বছরের রোজগার এই তিন দিনেই করে ফেলতে পারতো।

বিশু এই সব কথা ভাবছে, আর ঠিক সেই সময়েই ফণীবাবু এসে দাঁড়ালেন। বললেন, এইগুলো বিক্রি করছ তো? এই যে দুমদাম আওয়াজ। এক-একটা আওয়াজ হচ্ছে আর পিলে চমকে দিচ্ছে।

ফণীবাবু চেপে বসলেন ভাল করে। বললেন, ওদিকে ছাখোগে এই সব কাণ্ড যারা করছে, ঘরের পয়সা খরচ করে বাজি

পোড়াচ্ছে, বাড়ীতে তাদের দুঃখ কষ্টের অন্ত নেই। বাপ-দাদা টাকা টাকা করছে, আর ছোঁড়ারা পট্‌কা ফুটিয়ে টাকা নষ্ট করছে। আর তুমি এই ফাঁকে এই-সব বিক্রি করে কিছু রোজগার···

কথাটা তার শেষ হলো না। দুম করে কোথায় যেন একটা প্রচণ্ড আওয়াজ হলো। ফণীবাবু কানে হাত চাপা দিয়ে বললেন, দেখছো? এখন চলতেই লাগলো।

বিশু বললে, এখনই হয়েছে কি! এখনও কালীপুজো আছে। এই সব তৈরী করতে গিয়ে কত লোক জখম হবে, কত লোক মরবে।

ফণীবাবু বললেন, তুমি আর কথা বলোনা, থামো। আমার হাতে যদি আইন থাকতো তো তোমাকে আমি আগে জেলে পুরতাম, আর এইগুলো তৈরী করা বন্ধ করে দিতাম।

সুন্দর বেরোচ্ছিল বাড়ী থেকে। বাবাকে দেখে থমকে থামলো। থামতে হলো কারণ সিগ্রেটটা তখন সে সবে ধরিয়েছে। দোরের আড়ালে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সিগ্রেটটা টানতে লাগলো।

ওদিকে বিনয় আসছিল। ফণীবাবুকে দেখে সেও দাঁড়িয়ে পড়লো। হাতদুটি কপালে ঠেকিয়ে বললে, নমস্কার!

বলেই সে চলে যাচ্ছিল। ফণীবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার কাজকর্ম এখনও কিছু হলোনা?

—আজ্ঞে না।

—কোথায় যাচ্ছ? ফণীবাবু আবার জিজ্ঞাসা করলেন।

বিনয় বললে, কাজের সন্ধানেই যাচ্ছি। কলকাতার বাইরে নৈহাটি।

—নৈহাটিতে কাজ করবে?

বিনয় বললে, আজ্ঞে না। নৈহাটিতে এক ভদ্রলোকের বাড়ী। পরিচয় হলো। বাড়ীতে পুজো। আজ যেতে বলেছেন তাই যাচ্ছি। কাজ একটা তিনি করে দেবেন বলেছেন। মস্ত বড় একটা আপিসের বড়বাবু তিনি। চলি। নমস্কার।

আবার একটা নমস্কার করে বিনয় চলে গেল।

ফণীবাবু বললেন, জানো বিশু, ছেলেটি এম-এ পাশ। কাজের সন্ধানে ঘুরছে।

বিশু বললে, জানি। দিনকাল খুব খারাপ। দেশ স্বাধীন হলো। ভেবেছিলাম, মানুষগুলো খেয়ে-পরে বেঁচে থাকবে। কিন্তু হলো ঠিক তার উলটো। যতই দিন যাচ্ছে, মানুষের কষ্ট যেন ততই বাড়ছে। তা ভাগ্যিস আপনি আমাকে চরণে ঠাঁই দিয়েছিলেন তাই দুটো পয়সার মুখ দেখতে পাচ্ছি। নইলে কি যে হতো—

হাতের সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সুন্দর বেরিয়ে এলো। ফণীবাবু রয়েছেন বসে, কাজেই চোখমুখ বুজে জায়গাটা সে তাড়াতাড়ি পেরিয়ে যাচ্ছিল, ফণীবাবু জিজ্ঞাসা করে বসলেন, তোমার আপিস কি আজও খোলা নাকি?

সুন্দর দাঁড়ালো না। এই আপিস প্রসঙ্গে আরও যদি কিছু জিজ্ঞাসা করে বসেন, তাই একবার মাথাটা কাত করে হ্যাঁ বলেই সে একরকম পালিয়ে গেল।

বিশু বললে, পূজোর সময়েও আপিস খোলা, রোজগারপত্র ভালই হচ্ছে বোধহয়।

—হ্যাঁ তা হচ্ছে বই-কি! বিডন ষ্ট্রীটের বাড়ীর ভাড়াটা আদায় করতে গিয়ে প্রায় প্রতি মাসেই যখন শুনি বড়বাবু আদায় করে নিয়ে গেছেন, তখনই বুঝতে পারি রোজগার বেশ ভালই হচ্ছে।

বিশু বললে, বড়বাবু কে? সুন্দরবাবু?

—হ্যাঁ। শ্রীমান সুন্দর।

—উনি বড়বাবু, আর আপনি?

ফণীবাবু বললেন, আমি বুড়োবাবু। ওদের ভাষায় old fool.

বিশু বললে, আপনি নিজেই যখন বললেন তখন বলি। আমার কেমন যেন মনে হয়েছে, কিন্তু ভরসা করে বলতে পারিনি। ভাল একটি মেয়ে দেখে এবার আপনি সুন্দরের বিয়ে দিয়ে দিন।

—বিয়ে ? ফণীবাবু হাসলেন একটুখানি। বললেন, হ্যাঁ, দিতাম। যদি বুঝতাম আমার ছেলেটি ভালো। কেন মিছেমিছি এক ভদ্রলোকের মেয়েকে এনে কষ্ট দেওয়া।—যাক্‌গে, এই আমার অদৃষ্ট।

আবার একটা দুম করে আওয়াজ হলো। ফণীবাবু আবার তাঁর কানে হাত দিলেন।—এতো আচ্ছা বিপদে পড়লাম দেখছি! এটা কার অদৃষ্ট বল দেখি বিশু ? এই দুম্‌দুম্ আওয়াজ ?

বিশু চুপ করে রইলো।

ফণীবাবু বললেন, বলতে পারলে না তো। এ হচ্ছে গিয়ে দেশের অদৃষ্ট। আওয়াজ হচ্ছে খুব! কিন্তু ফাঁকা।

এই বলে তিনি হো হো করে হাসতে লাগলেন।

পূজার বাজনা বাজছে চারিদিকে। পান্নালালের ছাত থেকে সে বাজনার আওয়াজ বেশ ভালই শোনা যাচ্ছে। রিণি আর করালী ঘরের ভেতর বসে আছে। করালী বললে, আমার কি মনে হচ্ছে জানিস ?

রিণি বললে, কি মনে হচ্ছে ?

—মনে হচ্ছে, নীচের ঠাকুরপোকে সঙ্গে নিয়ে কলকাতার সব জায়গা ঘুরে ঘুরে ঠাকুর দেখে আসি।

রিণি বললে, তুমি একা যাবে ?

—নয় তো কি তুই ভেবেছিস নীচের ঠাকুরপোর সঙ্গে তোকে একা পাঠাব ?

—যাঃ-ও, তাই বুঝি আমি বলছি!

করালী বললে, মুখে বলছিস না, কিন্তু ইচ্ছেটি আছে ষোল আনা।

রিণি বললে, বেশ বাবা বেশ, তাই আছে তো আছে।

এমন সময় বাইরে থেকে কে যেন ডাকলে, মিস রিণি মুখার্জি বাড়ীতে আছেন ?

—কে যেন ডাকলে মনে হলো।

করালী বাইরে আসতেই দেখলে, একটা ছেলে একখানি চিঠি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। করালীকে দেখেই ছেলেটা জিজ্ঞাসা করলে, আপনার নাম রিণি মুখার্জি ?

করালী বললে, না। কেন ?

ছেলেটি বললে, খুব জরুরী একখানি চিঠি আছে মিস রিণি মুখার্জির নামে।

নিজের নাম শুনে রিণি বেরিয়ে এলো ঘর থেকে। জিজ্ঞাসা করলে, কে দিদি ?

করালী বললে, ওই শোন্, ছেলেটি কি বলছে।

ছেলেটি তার জামার পকেট থেকে একখানি চিঠি বের করে রিণির হাতে দিলে। রিণি চিঠিখানি পড়েই কেমন যেন হয়ে গেল।

করালী জিজ্ঞাসা করলে, কার চিঠি রে ?

রিণি করালীর হাতে চিঠিখানি দিয়ে ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করলে, এই চিঠির বিষয় তুমি কিছু জানো ?

ছেলেটি বললে, আজ্ঞে না।

—এই চিঠি তোমাকে কে দিলে ?

ছেলেটি বললে, আমাদের আপিসের এক বাবু।

রিণি তার কাপড় বদ্‌লে, চটি জুতো পায়ে দিয়ে, তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

করালী বললে, যাচ্ছিস ?

—হ্যাঁ দিদি।

—কিন্তু শোন্। বলে করালী তাকে একটু দূরে টেনে নিয়ে গিয়ে বললে, ত্যাখ্, চিঠিখানা তোর দাদা তো নিজের হাতে লেখেনি।

রিণি বললে, না লিখলেও দাদা যে আজ নৈহাটি যাবার জন্যে বাড়ী থেকে বেরিয়েছে সেকথা তো কেউ জানে না। ও চিঠি দাদাই লিখেছে।

এই বলে সে চলে যাচ্ছিল, করালী বললে, দাঁড়া, আসছি।

করালী চট্ করে পাঁচ টাকার একটি নোট এনে রিণির হাতে গুঁজে দিয়ে বললে, সঙ্গে নিয়ে যা। সোমত্ত মেয়ে—হাতে কিছু না নিয়ে কোন্ সাহসে যে বেরিয়ে যাচ্ছিস কে জানে।

ছেলেটিকে সঙ্গে নিয়ে রিণি চলে গেল। বিনয়ের চিঠিখানা কিন্তু রয়ে গেল করালীর হাতে।

বস্তির মাঠে থিয়েটারের স্টেজ বাঁধা হয়ে গেছে। ছেলেরা সিন টাঙ্গাচ্ছে। পরেশ রয়েছে তাদের সঙ্গে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে। ক্লাবের সেক্রেটারী পাটু এসে পরেশকে ধরে বসলো, তোমাকে ভাই একটি কাজ করতেই হবে। একা আমার অনুরোধও নয়, আমাদের সবাইকার অনুরোধ।

—কাজটা কি করতে হবে শুনি আগে। পরেশ বললে, কিন্তু ভাই পয়সাকড়ির ব্যাপার হলে আগেই বলে রাখছি, পারবো না কারণ জানোই তো সব—

পাটু বললে, না রে ভাই না, পয়সা চাই না তোমার কাছ থেকে। তোমাকে ভাই একবারটি যেতে হবে পান্নালালের ছাতে।

পরেশ বললে, ওরে বাবা, বৌদি দেখতে পেলে খুন করে ফেলবে।

—না না, দেখতে পাবে না। যেতে তোমাকে হবেই।

পরেশ বললে, আমি যাই না সেখানে, তবু বলছো যেতে হবে।

পাটু বললে, তবু বলছি যেতে হবে।

—কাজটা কি শুনি?

—কাজটা হচ্ছে গিয়ে—ছাখো, বোসবাগান ক্লাব, ঘোষপাড়া ক্লাব এমন কি ছোট ওই রেনবো ক্লাবটা পর্যন্ত থিয়েটারের প্লের আগে একটা নাচ দেবে। আমরাই বা বাদ যাব কেন।

পরেশ বললে, বুঝেছি। রিণিকে বলতে হবে নাচো। ওরে বাবা আমি পারব না।

পাটু বললে, তুমি পারবে না তো কে পারবে শুনি?

পরেশ বললে, ওর দাদা বিনয় ওকে এইখানে নাচতে দেবে ভেবেছ? নেহাৎ বাচ্চা মেয়ে হয়, বলা যায়, কিন্তু না না রিণিকে বলতে আমি পারব না।

পাটু এইবার অন্য পথ ধরলে। বলল, তাহ'লে বল আপত্তিটা তোমার?

—কেন? আমার কেন?

পাটু বললে, আমি বুঝি জানি না, তোমার সঙ্গে রিণির বিয়ে হবে। ভাবী স্ত্রীকে নাচতে দিতে তুমি চাও না। এই তো?

পরেশ আর আপত্তি করতে পারলে না। বললে, বেশ যাচ্ছি, কিন্তু রিণি আসবে কি আসবে না তা আমি বলতে পারব না।

—তুমি একটিবার বললেই আসবে। তুমি যাও তো। এই বলে জোর করে পরেশকে পাঠিয়ে দেওয়া হলো।

পরেশ পান্নালালের ছাতে গিয়ে ডাকলে, বৌদি! ছাতের বৌদি!

করালী চুল আঁচড়াচ্ছিল, খোলা চুলের ওপর মাথার কাপড়টা তুলে দিয়ে বললে, এসো।

পরেশ জিজ্ঞাসা করলে, কি করছো?

করালী বললে, তোমারই কথা ভাবছি।

—আমার এত সৌভাগ্য? একা-একা যে? তিনি কোথায়?

করালী হেসে বললে, তিনি কিনি? রিণি?

পরেশ মুখ টিপে মাথা নেড়ে বুঝিয়ে দিলে, সে তারই কথা বলছে।

—তারই খোঁজে এসেছ বুঝি?

পরেশ বললে, বলতে সাহস হচ্ছে না। আচ্ছা ধরে নাও, তাই।

করালী জিজ্ঞাসা করলে, কিছু বলবে? না শুধু দেখবে একবার?

পরেশ বললে, তবে শোনো বৌদি, বস্তির মাঠে থিয়েটার হবে শুনেছ নিশ্চয়ই।

—তার চেয়ে বেশি কিছু শুনেছি। শুনেছি তুমি নাকি গাইবে, হিরো সাজবে।

—এ খবর তুমি পেলে কোথায়?

করালী হেসে বললে, যিনি তোমার সব খবর রাখেন সেই তিনির কাছ থেকে।

পরেশ বললে, সে কি আমার সব খবরই রাখে?

করালী বললে, হ্যাঁ। গুপ্তচর কানাইএর কাছে তোমার খবর না পেলে তার ঘুম হয় না। লক্ষণ ভালো। এখন শুধু সব ভাল যার শেষ ভাল হলেই ব্যস্, জ্বালা যন্ত্রণা সব চুকে যায়। তুমি কি থিয়েটার দেখবার জন্যে রিণিকে নেমন্তন্ন করতে এসেছ নাকি?

পরেশ বললে, না বৌদি, মাঠের থিয়েটারে নেমন্তন্ন করবার দরকার হয় না। যে জন্যে এসেছি শোন। পাড়ার ছেলেদের ইচ্ছে থিয়েটার আরম্ভ হবার আগে রিণি একবার নাচবে আর একটি গান গাইবে।

—এ তো গেল পাড়ার ছেলেদের ইচ্ছে। তোমার কি ইচ্ছে তাই শুনি?

—আমার কোনও ইচ্ছে টিচ্ছে নেই বৌদি। এই কথাটা বলবার জন্যে ওরা পাঠিয়ে দিলে—

করালী একটু বিদ্রূপের ভঙ্গীতে বললে, ওরা পাঠিয়ে দিলে! তুমি কি রবারের বল্ যে ওরা পায়ে করে ঠেলে দিলে আর তুমি অমনি গুড়গুড় করে চলে এলে? যাও বলগে, রিণি কিছুতেই রাজী হলো না।

পরেশ বললে, ঠিক বলেছ ছাতের বৌদি। লজ্জায় আমি ওদের বেশি কিছু বলতে পারলাম না। আমি যে এই কথা বলতে এসে-ছিলাম রিণিকে সে কথা তুমি বলো না। আড়ি পেতে শুনলে না তো?

করালী বললে, না। সে বাড়ীতে নেই।

পরেশ বললে, বাড়ীতে নেই? কোথায় গেছে? পান্নালালও নেই? বিনয়ও নেই? বাড়ীতে কি তুমি একা রয়েছ?

করালী বললে, হ্যাঁ একাই রয়েছি। রিণি ছিল, একটা ছেলে এসেছিল একখানা চিঠি নিয়ে। ওর দাদা নাকি ওকে যেতে লিখেছে তাই চলে গেল।

—কোথায় যেতে লিখেছে?

করালী বললে, তবে আর বলছি কি! চিঠিতে না-আছে ঠিকানা, না-আছে কিছু। তার ওপর লেখাটাও ওর দাদার নয়।

—তাহলে ও গেল কেন?

—বারণ করেছিলাম। করালী বললে, ও শুনলে না। বললে, দাদা যে আজ নৈহাটি যাবার জন্যে বাড়ী থেকে বেরিয়েছে সে-কথা এক আমি ছাড়া আর কেউ জানে না।

—চিঠিতে নৈহাটির কথা লেখা ছিল বুঝি?

করালী বললে, চিঠিখানা আছে আমার কাছে। এনে দিচ্ছি, ছাখো। এই বলে চিঠিখানা এনে করালী পরেশের হাতে দিয়ে বললে, পড়।

পরেশ পড়লে। বড় চিঠি নয়। পড়তে বেশিক্ষণ লাগলো না।

করালী বললে, রিণি বোকা মেয়ে নয়, লেখাপড়া-জানা চালাক-চতুর মেয়ে, একা একা যেখানে-সেখানে যায় জানি, তবু কলকাতা শহর, কত রকমের কত বজ্জাত লোক, কত রকম খারাপ মতলব নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। আমার তখন থেকে কেমন-যেন ভাল লাগছে না ভাই।

পরেশের হঠাৎ কি-যেন একটা কথা মনে পড়লো। মনে পড়তেই সে তার পকেট হাতড়াতে লাগলো।

করালী জিজ্ঞাসা করলে, পকেটে কি দেখছো?

টুকরো কাগজ একটা সে বের করলে। কাগজটা এমন বিশেষ কিছুই নয়; ছাপা একখানা চিঠির কাগজের ঠিকানা-দেওয়া মাথার

অংশটা। এইটেই একদিন সুন্দর দিয়েছিল পরেশকে, তাদের আপিসের ঠিকানা জানাবার জন্যে। সেইটির নীচে আজকের এই চিঠিটা মেলে ধরে ছেঁড়া অংশ দুটির জোড় মিলিয়ে দেখলে—ঠিক মিলে গেল। এটা সেই চিঠির কাগজেরই নীচের সাদা দিকটা। জোড়াটা মিলে যেতেই পরেশ বললে, দেখবে এসো বৌদি, যা ভেবেছি ঠিক তাই। রিণিকে কোথায় নিয়ে গেছে ছাখো।

করালী বললে, দেখি কি রকম ডিটেকটিভের কাজ করলে। প্রেমের জন্যে মানুষ অসাধ্য সাধন করে, তুমি বুঝি ঠিকানা বের করলে ?

করালী দেখতে লাগলো ঝুঁকে পড়ে।

পরেশ বললে, সুন্দর একদিন আমাকে তার আপিসের ঠিকানা দিয়েছিল চিঠির কাগজের মাথার দিকটা ছিঁড়ে। চললাম বৌদি, রিণিকে নিয়ে ফিরে আসছি। কার কাজ বুঝলে?

—ছোঁড়া তো ভারি পাজি হয়েছে দেখছি। একা যাবে ? সঙ্গে কাউকে নিয়ে গেলে হ'তো না ?

পরেশ বললে, না বৌদি, কাউকে নেবো না।

এই বলে পরেশ এগিয়ে গিয়েও সিঁড়ির কাছ থেকে আবার ফিরে এলো। বললে, আসল কথাটাই বলতে ভুলে যাচ্ছি বৌদি, তোমার কাছে বলতে লজ্জা নেই। কয়েক আনা পয়সা দাওতো।

করালী বললে, দিচ্ছি। আঁচলের খুঁট থেকে দুটো টাকা বের করে বললে, এই নাও, এই দুটো টাকা নিয়ে যাও।

—অত কেন ?

—সঙ্গে থাক ; রিণির কাছে পাঁচ টাকা আছে। আসবার সময় ট্যাক্সি করে এসো। মজা করবার জন্যে দুজনে যেন হেঁটে হেঁটে গল্প করতে করতে এসো না।—হাঁ আর-একটা কথা, প্রেমিকাকে উদ্ধার করতে গিয়ে পুজোর দিনে যেন মাথা ফাটিয়ো না।

পরেশ হাসতে হাসতে চলে গেল।

ওদিকে Master Entertainers এর আপিসে সুন্দর লুকিয়ে রয়েছে পাশের ঘরে, আর রিণি বিজনকে নিয়ে পড়েছে। বিজন বলে ফেলেছিল, আপনার দাদার চোটটা লেগেছে মাথায়।

রিণি ধরে বসেছে, চিঠিতে লিখেছেন হাতে, আর এখন বলছেন মাথায়। আপনার কথা আমি ভাল বুঝতে পারছি না।

বিজন বলে উঠলো, ওই হাতে মাথায়, মাথায় হাতে সব জায়গাতেই লেগেছে।

রিণি বললে, চলুন আর দেরি করবেন না। দাদার কাছে নিয়ে চলুন আমাকে। দাদাকে আপনি হাসপাতালে নিয়ে না গিয়ে আপনার এক বন্ধু ডাক্তারের বাড়ীতে তুললেন—সব যেন গোলমেলে ব্যাপার বলে মনে হচ্ছে। আপনাকে আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।

বিজন বললে, বিশ্বাস করতে পারছো না? বোসো, বলছি। বাঃ, তোমার এই শাড়িটি তো বেশ! কে দিলে?

রিণি এইবার চটে গেল। বললে, কী যা-তা কথা বলছেন আপনি?

বিজন হেসে উঠলো।

—হাসছেন আপনি?

এবার আর রিণির কোনও সন্দেহ রইলো না যে, তার দাদার এ্যাক্সিডেন্টের কথা সব মিথ্যা। কৌশল করে তাকে এখানে আনা হয়েছে।

সন্দেহটা তার একেবারে বদ্ধমূল হয়ে গেল যখন দেখলে বিজন তার ড্রয়ার থেকে কয়েকটি বাণ্ডিলে-বাঁধা অনেকগুলো দশ টাকার নোট বের করে তার হাতের সামনে ফেলে দিয়ে বললে, আমাকে বিশ্বাস করছ না, কিন্তু আমার এই টাকাগুলোকে বিশ্বাস করবে তো?

রিণি বললে, বুঝেছি। চিঠি-ফিটি সব মিছে কথা। সুন্দরবাবুর নাচের কোম্পানী এটা। আমাকে এমনি করে আপনারা—

কথাটা বিজন তাকে শেষ করতে দিলে না। বললে, বাস্ বাস্

বাস্, তুমি সবই জানো যখন—নাও, তোলো টাকাটা। এক মাসের মাইনে অগ্রিম দিলাম। তোমাদের অভাব সেদিন আমি নিজের চোখেই দেখে এসেছি। সুন্দরের সঙ্গে সেদিন আমিই গিয়েছিলাম

রিণি বললে, সেই জন্যেই অভদ্র ইতরের মত চালাকি করে চিঠি লিখে আমাকে এখানে এনে টাকার লোভ দেখাচ্ছেন ?

এইবার ঘরে ঢুকলো সুন্দর। বললে, জানাজানি যখন হয়েই গেল তো ভাল করেই হোক। —আরে না, না, চিঠির কথা Forget me not, forget me not—ভুলে যাও, ভুলে যাও।

বিজন বললে, বল তো ভাল করে বুঝিয়ে।

রিণি বললে, এর ভেতর ভাল করে বুঝিয়ে বলবার কি আছে !

সুন্দর টেবিলের ওপর চেপে বসলো। বললে, আছে আছে সেদিন He had I বগল-দাবাইং my three-fifty rupees harmonium gone uping-up uping-up to your roofhome আর তুমি তখন dressing up your ছেঁড়া কাপড়, Shutting up বল্টু in your দরমা-house—মনে পড়ছে তো ? তারপর ভেবেছিলাম আর-একদিন যাব। কিন্তু ওই যে পান্নালালের wife মা কালী-করালী—বাবাঃ, যেরকম কথা বললে, after that with what mouth I shall go into you ? আর সেই জন্যেই ফলসিফাইং লেটার, টেকিং ইউ ইনটু আওয়ার আপিস, নোবডি হিয়ার, গিভিং ইউ একটি হাজার নগদ। টেক এণ্ড গো। বাস্—মারো Fort william।

রিণি বললে, ছি ছি ছি।

সুন্দর বললে, ছি ছি কোরো না। No ছি ছি business. টাকাটা তোলো।

—চেঁচাবেন না। আপনি চুপ করুন।

সুন্দর বললে, চেঁচাচ্ছি কোথায় ? ব্যাপারটা চুপিচুপিই তো হচ্ছে।

বিজন বললে, তোলো তোলো টাকাটা তোলো।

—এই যে তুলছি।

টাকার বাণ্ডিলগুলো রিণি টেবিলের ওপর থেকে তুলে নিয়ে, বিজনের আর সুন্দরের মুখের উপর ছুঁড়ে মারলে! বললে, ইতরামি করবার আর জায়গা পাননি! এই নিন আপনাদের টাকা। আর জেনে রাখুন—

—তোমাকে জানাতে হবে না। আমি জানাচ্ছি।

বলতে বলতে দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকলো পরেশ।

পায়ের জুতো খুলে পরেশ মারতে উঠেছিল সুন্দরকে। কিন্তু কোথায় যেন বাধলো। তাই চটিটা হাত থেকে ফেলে দিয়ে বাঁহাত দিয়ে ধরলে তার জামার কলার, তারপর ঠাস্ ঠাস্ করে তার গালে চড় মারতে মারতে বলতে লাগলো, ইতর অভদ্র কোথাকার! তুমি ফণীবাবুর ছেলে! লজ্জা করে না তোমার এই সব ইতরাম করতে?

বিজন আর সুন্দর দুজনে যদি রুখে দাঁড়াতো তাহলে হয়ত পরেশের সাধ্য ছিল না সুন্দরকে এমনি করে মারবার। কিন্তু দুনিয়ার এমনি মজা, অপরাধী যারা, যারা কাপুরুষ, পৌরুষের কাছে এমনি করেই তারা মাথা নত করে, এমনি করেই তারা মার খায়।

সুন্দরের এই অবস্থা দেখে বিজন সরে পড়েছিল পাশের ঘরে। ফিরে যখন এলো, দেখলে সুন্দর টেবিলের উপর কাৎ হয়ে পড়ে আছে আর রিণিকে নিয়ে পরেশ চলে গেছে।

বিজন এসে বললে, ছি ছি ছি ছি এমন কাঁচা কাজও করিস তুই। পরেশটা কেমন করে খবর পেলে বল্ দেখি?

সেকথার জবাব না দিয়ে সুন্দর বললে, আমিও দেখে নেবো ব্যাটাকে। এর প্রতিশোধ আমি নেবোই।

ষ্টেজের সামনে মাঠে তখন লোকজন এসে বসছে। গোলমাল চলছে খুব। ক্লাবের ছেলেরা উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠেছে রিণির জন্যে। খবর নিয়ে জেনেছে রিণিও বাড়ীতে নেই, পরেশও নেই।

সেক্রেটারী বললে, সুবিধে পেয়ে আজ দু'জনেই উড়লো নাকি? পরেশ না হ'লে তো থিয়েটার বন্ধ। ডোবাবে নাকি শেষ পর্যন্ত!

এমন সময় দেখা গেল, পরেশ আর রিণি দুজনেই আসছে।

জন কতক ছেলে শিউলিতলা লেনের মোড়ে দাঁড়িয়েছিল, রিণি আর পরেশকে আসতে দেখে বললে, যাক্ বাবা, বাঁচালে। আবার ওদিকে কেন, একেবারে আমাদের গ্রীনরুমে গিয়ে বসবে চল।

পরেশ বললে, না রিণি নাচবে না। চল্ আমি যাচ্ছি। রিণি, তুমি বাড়ী চলে যাও

পরেশের হাতে একটু চাপ দিয়ে রিণি চুপি চুপি বললে, যাচ্ছি। তুমি আসবে না?

—আসছি। ওদের বলে আসি।

রিণি চলে গেল বাড়ীর দিকে, আর পরেশ গেল বস্তির মাঠে। রিণি নাচবেনা শুনে সবাই হতাশ হয়ে গেল। পরেশ বললে, অনেক করে বলেছি, কিন্তু কিছুতেই রাজী হলো না। তার ওপর ওর দাদা নেই বাড়ীতে। কুমারী মেয়ে। ভরসা পাচ্ছে না।

এই কথা বলেই পরেশ চলে আসছিল, ষ্টেজ-ডিরেক্টর নন্তু ঘোষ বললে, যাচ্ছিস কোথায়? মেক্-আপ্ করতে বসে যা।

পরেশ বললে, এখনও অনেক বাকি। লোকজন আসুক। মাঠ তো খালি। এই বলে পরেশ সত্যিই চলে যাচ্ছিল। দেখলে কানাই কার সঙ্গে যেন চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে খুব ঝগড়া করছে। পরেশকে দেখতে পেয়ে কানাই ডাকলে, ছোট কাকাবাবু, শোন!

পরেশের মন পড়ে ছিল তখন পান্নালালের ছাতে। সুন্দরের কথাটা ছাতের বৌদিকে এখনও বলা হয়নি। তাছাড়া ছাতের বৌদিকে বলতে হবে—রিণিকে নিয়ে সে যেন আসে তাদের থিয়েটার দেখতে। আজ সে 'সিরাজ' সাজবে। তার ইচ্ছে—রিণি দেখুক তার অভিনয়।

কানাই এর ডাক শুনে পরেশ তার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো।

—কি বলছিস বল্ শিগ্গির। আমার কাজ আছে।

কানাই বললে, দ্যাখো না কাকাবাবু মাসীর জন্যে এইখানে

জায়গা রেখেছি, মানা বলছে তার দিদি বসবে। বলছে তুই অন্য কোথাও একটা জায়গা দেখে নে।

পরেশ তাকিয়ে দেখলে মানার দিদি দাঁড়িয়ে আছে। বললে, তা বেশ তো, বসুক না মানার দিদি। বৌদি এখন আসবে না। আসে তো জায়গা একটা করে দেওয়া যাবে।

কানাই বললে, বা রে, সন্ধ্যে থেকে এই জায়গাটা আগলে আমি বসে আছি, আর মানার দিদি এই মাত্তর এলো। এসেই বসে পড়বে এইখানে ?

মানার দিদি করুণ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে পরেশের দিকে। যেন তার হুকুম হলেই সে বসতে পারে। পরেশ বললে, বোসো। ওর কথা শুনছো কেন ?

মানার দিদি সেইখানে বসে পড়লো। কানাইএর মাথায় একটা চাঁটি মেরে মানা বললে, হলো তো ?

কানাই তখন পরেশের দিকে রেগে মেগে তাকাচ্ছে।

পরেশ চলে গেল।

কানাই এইবার মানার দিকে ফিরে তাকালো। বললে, তুই আমার মাথায় চাঁটি মারলি কেন রে ?

—বেশ করলাম। মানা বললে, বসতে দিচ্ছিলি না যে। ওটা তোর কেনা জায়গা ?

এমন সময় লাউড্ স্পিকারে বলে উঠলো, বড্ডো গোলমাল হচ্ছে! আপনারা চুপ করুন। আজ আমরা ভেবেছিলাম শ্রীমতী রিণি দেবীর নাচ দিয়ে আমরা আমাদের অনুষ্ঠান-সূচী আরম্ভ করবো। কিন্তু কোনও অনিবার্য কারণে তা আর সম্ভব হলো না। আপনারা চুপ করে বসুন। এক্ষুনি আমাদের গান আরম্ভ হবে।

কানাই গজগজ করতে করতে বসে পড়লো।

পাড়ার কয়েকজন ছেলে-মেয়ের গান করবার কথা। তার জন্যে তারা অনেক বেশি চাঁদা দিয়েছে। কাজেই গোলমাল চুপ করবার জন্য ড্রপ তুলে দেওয়া হলো। লাউড স্পিকারে আবার বললে,

এইবার গান গাইছে—শ্রীহারাধন চক্রবর্তী। তারপর গাইবেন কুমারী শ্রীমতী কল্পনা সান্যাল।

কানাই তন্ময় হয়ে গান শুনতে লাগলো।

দু'তিনটে গান শোনবার পরই তার মনে পড়লো, মাসী বলেছে—চট্ করে একবার খেয়ে যাবি। তুই খেলেই আমার ছুটি। ঠাকুরপো আজ থিয়েটারেই খাবে।

কানাই উঠলো। থিয়েটার আরম্ভ হবার আগে খেয়ে আসা যাক্।

মাঠ থেকে যেই বেরিয়েছে, অমনি একটা দুম্ করে আওয়াজে কানাই চম্‌কে উঠলো। কানে হাত চাপা দিয়ে বললে, ওরে বাবা।

শিউলিতলা লেন আজ থম থম করছে। বিশুর দোকান বন্ধ। সবাই বোধহয় গেছে থিয়েটার দেখতে।

কানাই আসছিল বাড়ীর দিকে, আর পান্নালালের ছাত থেকে নেমে পরেশ যাচ্ছিল বস্তির মাঠে। তাড়াতাড়ি গিয়ে সাজতে হবে। দেরী হয়ে গেল কিনা কে-জানে।

কানাইকে আসতে দেখে পরেশ জিজ্ঞাসা করলে, কিরে, চলে এলি যে? কি হচ্ছে ওখানে?

কানাই রেগেই ছিল, বললে, খ্যামটাউলির নাচ তো হল না।

এই বলে একটু পাশ কাটিয়ে সে পালাবার চেষ্টা করলে।

পরেশ ছুটে গিয়ে ধরলে তার হাতটা চেপে।—কি বললি?

কানাই বললে, যাও! তুমি আমার সঙ্গে কথা বলো না। ছেড়ে দাও!

পরেশ বললে, রিণিকে তুই খ্যামটাউলি কেন বললি, বল!

—তুমি আমাকে কি রকম অপমান করলে বল দেখি? মানা তোমার আস্কারা পেয়ে আমার মাথায় চাঁটি মেরে দিলে।

—বেশ করলে। রিণিকে তুই খ্যামটাউলি কেন বললি বল্।

—বললাম বেশ করলাম। আবার বলবো।

পরেশ তার মাথায় এক চড় মেরে বললে, বল্ আর বলবো না।

—তুমি মারলে কেন, নিশ্চয় বলবো।

আবার এক চড় মারলে পরেশ। বললে, বলবি ?

—হ্যাঁ বলবো।

ওদিকে দেরি হয়ে যাচ্ছে পরেশের। কানাইএর সঙ্গে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আর কত বকবে ? আবার তার মাথায় একটি চড় মেরে দিয়ে বললে, ভাগ্‌!

বলেই পরেশ চলে যাচ্ছিল। হঠাৎ তার পিঠে দমাক্‌ করে একটা আধলা ইঁট এসে লাগলো। উঃ! বলে ফিরে দাঁড়িয়ে দেখলে, কানাই তাকে ইঁট ছুঁড়ে মেরেছে। খুব রাগ হয়ে গেল পরেশের। সেই ভাঙা ইঁটটা কুড়িয়ে নিয়ে বললে, তবে রে শয়তান!

বলেই ইঁটটা সে বেশ একটু জোরেই ছুঁড়ে দিলে কানাইএর দিকে।

ভেবেছিল লাগবে না, কিন্তু ইঁটটা সত্যি-সত্যিই লাগল গিয়ে কানাইএর মাথায়। আর ঠিক সেই সময়েই কাছাকাছি কোথায় যেন একটা পটকা ফাটার বিরাট আওয়াজ হলো। কানাইও কেমন যেন বিশ্রী একটা আর্তনাদ করে উঠলো, তারপর হাতদুটো কানের কাছে তুলে কাঁপতে কাঁপতে শুয়ে পড়লো রাস্তার ওপর।

ভাগ্যিস্‌ পট্‌কার আওয়াজটা হয়েছিল, নইলে কানাইএর চীৎকার শুনে বৌদি হয়ত ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে আসতো। কেলেঙ্কারীর বাকি কিছু থাকতো না। কিন্তু হতভাগা পথের ওপর ছল করে শুয়ে পড়লো ছ্যাখো! মাসীকে না জানিয়ে ছাড়বে না দেখছি।

পরেশ যেতে যেতেও ফিরে এলো কানাইএর কাছে। হাত জোড় করে বললে, আমার অপরাধ হয়েছে বাবা কানাই, ওঠো। বৌদিকে আর জানিয়ো না। কিন্তু একি! কানাই তার মুখটা কেমন যেন করছে। গল্‌ গল্‌ করে রক্ত বেরুচ্ছে তার মাথা থেকে। — কানাই! কানাইএর মুখের কাছে ঝুঁকে পড়লো পরেশ। কানাই! কানাই!

কোনও সাড়া শব্দ নেই। এক দৃষ্টে চেয়ে আছে, চোখের পলক পড়ছে না। পরেশ তার বুকে হাত দিয়ে দেখলে, নাকে হাত দিয়ে দেখলে, নিশ্বাস পড়ছে না, সব শেষ হয়ে গেছে।

কানাইকে আড়্‌কোলা করে তুলে পরেশ তাড়াতাড়ি তাকে বাইরের ঘরে নিয়ে গিয়ে তার নিজের খাটের ওপর শোয়ালে। তারপর আবার তার বুকের ওপর কান পেতে অনেকক্ষণ ধরে দেখলে, কোনও স্পন্দন নেই। নাকে হাত দিয়ে দেখলে, নিশ্বাস পড়ছে না। সেখান থেকে উঠে গিয়ে দোরটা প্রথমে বন্ধ করে এলো, সুইচ টিপে আলোটা জ্বাললে, তারপর আবার কানাইএর কাছে গিয়ে নাকে হাত দিয়ে, বুকে হাত দিয়ে, নেড়ে চেড়ে অনেক রকম করে দেখলে, কিন্তু না, সত্যিই সে মরে গেছে।

কানাই মরে গেছে—ভাবতেও পরেশ যেন শিউরে উঠলো। এই মাত্র যে-কানাই বেঁচে ছিল, যার সঙ্গে সে ঝগড়া করছিল, সে আর কখনও কথা বলবে না। একি সর্বনাশ! কি করতে কি হয়ে গেল। পরেশের হাত দুটো কাঁপতে লাগলো।

কানাই-এর মুখের পানে তাকাতে পারছে না সে। চট্ করে আলোটা নিভিয়ে দিয়ে পরেশ দোরের কাছে দাঁড়িয়ে রইলো। কিন্তু সে যে আর দাঁড়িয়ে থাকতেও পারছে না, মাথাটা ঘুরছে। কপাটটা ধরে কোনরকমে টাল্ সামলে নিলে। তারপর সেই অন্ধকারে কানাইএর নীরব নিস্পন্দ মৃতদেহের কাছে গিয়ে বসলো। এই কিছুক্ষণ আগে যার সঙ্গে ঝগড়া করছিল তাকেই দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে হো হো করে কেঁদে উঠলো।

কাঁদতে কাঁদতে পরেশ বললে, না না এমন করে তোকে মারতে আমি চাইনি কানাই। তোকে আর কখনও কানা বলবো না। বৌদির কাছে আমি মুখ দেখাবো কেমন করে? কানাই! কানাই!

বাইরে থেকে পাড়ার একটা ছেলের ডাক শোনা গেল, কানাই! কানাই!

পরেশ দাঁতে দাঁত চেপে চুপ করে রইলো। তাড়াতাড়ি কাপড়ের খুঁট দিয়ে চোখদুটো মুছে নিলে।

ছেলেটা আবার ডাকলে, কানাই।

বাড়ীর ভেতর থেকে মলিনা বলে উঠলো, কানাই তো বাড়ীতে নেই! তাকে দেখতে পাস তো ডেকে দিবি তো বাবা।

ছেলেটা তাই শুনে বোধকরি চলে গেল। আর ঠিক সেই সময় দোরটা ঠেলে কে যেন ঘরে ঢুকলো। খিলটা পরেশ বন্ধ করতে ভুলে গিয়েছিল।

পরেশ চমকে উঠে চাপা-গলায় বললে, কে?

প্রকাশ। তার দাদা ঘরে ঢুকেছে। প্রকাশ বললে, ও, তুই রয়েছিস? দোরটা ঠেলতেই খুলে গেল। তাই ভাবলুম—

কথাটা তাকে শেষ করতে না দিয়ে পরেশ ডাকলে, দাদা! দাদা!

প্রকাশ চলে যাচ্ছিল। ফিরে দাঁড়ালো।

পরেশ বললে, সর্বনাশ হয়ে গেছে দাদা। কানাই মরে গেছে। আমি তাকে মেরে ফেলেছি।

প্রকাশ বললে, সে কি?

—হ্যাঁ দাদা, এরকম যে হবে তা আমি ভাবতে পারিনি। আমার সঙ্গে রোজ যেমন হয় তেমনি দু-একটা কথা-কাটাকাটি হতে হতে ও একটা আস্ত ইঁট ছুঁড়ে মারলে আমাকে। আমিও রাগের মাথায় সেই ইঁটটা ছুঁড়ে মেরেছিলাম তার দিকে। বাস্, সেই ইঁট খেয়েই ও শুয়ে পড়লো। গিয়ে দেখি—সব শেষ। ওখান থেকে তুলে এনে আমি এইখানে শুইয়ে দিয়েছি।

বলতে বলতে পরেশ হো হো করে কেঁদে উঠলো।—আমার জেল্ হোক্ ফাঁসি হোক্, কোনও দুঃখু নেই দাদা, কিন্তু বৌদির কাছে আমি মুখ দেখাবো কেমন করে? দাদা, এ আমি কী করলাম?

প্রকাশ বললে, কাঁদিসনি, চুপ কর। আমি একবার চরণ উকিলকে ডাকি।

প্রকাশ চলে গেল। অন্ধকার ঘরের মাঝখানে পরেশ চুপ করে

দাঁড়িয়ে আছে, এমন সময় আবার একটা ছেলে বোধকরি বস্তির মাঠ থেকে পরেশকে ডাকতে এলো। পরেশ না হলে ওদের থিয়েটারে ড্রপ উঠবে না।

ছেলেটা ডাকলে, পরেশদা! পরেশদা!

কোনও সাড়া না পেয়ে এ-দরজা ছেড়ে ছেলেটা প্রকাশের সদর দরজায় গিয়ে ডাকলে, বৌদি! বৌদি!

পাড়ার অনেক ছেলেকেই চেনে মলিনা। গলার আওয়াজ শুনেই টের পেলে। বললে, কে রে, শঙ্কর?

—হ্যাঁ বৌদি, আমি শঙ্কর। পরেশদা কোথায়?

মলিনা বললে, তা তো জানি না ভাই।

দোরের কাছে এগিয়ে এসে বললে, ঠাকুরপো তোদের ওইখানেই আছে কোথাও ভিড়ের মাঝখানে।

শঙ্কর বললে ওখানে নেই বলেই তো দেখতে এলাম।

মলিনা বললে, তুই একটি কাজ কর্ ভাই শঙ্কর। কানাইকে গিয়ে বল্ তোর মাসী ডাকছে। হতভাগা ছেলে বললে খেয়ে নেবে সকাল-সকাল, বলে আবার সব ভুলে বসে রইলো।

শঙ্কর বললে, দিচ্ছি ডেকে। বলেই সে চলে গেল।

প্রকাশ আসছে চরণকে নিয়ে। চরণ আস্তে আস্তে কথা বলতে জানে না। উকিল মানুষ—সব সময়েই জোরে কথা বলা অভ্যাস। সে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলছে, তাহলে Place of occurance হলো গিয়ে—

প্রকাশ রাস্তার ওপর আন্দাজে একটা জায়গা দেখিয়ে দিয়ে বললে, এইখানে।

পরেশ অন্ধকার ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। ঠিক জায়গাটা দেখিয়ে দিয়ে বললে, না এইখানে।

চরণ-উকিল দেখলে, কাঁচা রক্ত তখনও সেখানে জমাট বেঁধে পড়ে রয়েছে। বললে, এবার ঘরের ভেতর চল, dead body দেখবো।

তাদের ঘরে নিয়ে এসে পরেশ কানাইকে দেখিয়ে দিয়ে বললে, ওই তো শুইয়ে রেখেছি।

চরণ বসলো। বললে, এখন কি করতে হবে বল। বাঁচাতে হবে পরেশকে। এই তো ?

প্রকাশ বলে উঠলো, হ্যাঁ ভাই, ওকে বাঁচাবার পথ বলে দাও।

চরণ-উকিল আজ একটা কাজের মত কাজ পেয়েছে। তার কথা বলবার ধরণটাও তাই বদ্‌লে গেছে একটু। বেশ গম্ভীর হয়ে বললে, ত্থাখো প্রকাশ, খুনের আসামীকে বাঁচাতে হলে আগে কোন্ জিনিসটির দরকার জানো ?

কথাটা এমন ভাবে সে বললে, যেন কত খুনের আসামীকে সে বাঁচিয়েছে।

প্রকাশ বললে, কোন্ জিনিসের দরকার কেমন করে জানবো ভাই ! এমন বিপদে তো কখনও পড়িনি।

চরণ বললে, দরকার টাকার।

প্রকাশ বললে, টাকার ? কিন্তু ভাই, তুমি তো জানো আমার অবস্থা। ফণীবাবু আছেন বলে—কোনরকমে বেঁচে আছি।

চরণ বললে, আচ্ছা শোনো, তার আগে একটা কথা বলে রাখি। পরেশকে বাঁচাতে হলে বলতে হবে—তোমার স্ত্রী ওকে মেরেছে। বলতে হবে—ছেলেটা কথায় কথায় রাগ করতো, মাসীমার অবাধ্য ছিল, আজ অমনি রাগ করে মাসীমাকে কি-যেন বলতেই মাসীমা দেয়ালের গায়ে তার মাথাটা দিয়েছে ঠুকে। বাস, ক্ষীণজীবী ছেলেমানুষ, তাইতেই মাথা থেকে রক্ত বেরিয়ে মরে গলে।

প্রকাশ কি যেন বলতে যাচ্ছিল।

চরণ তাকে কিছু বলতেই দিলে না। বললে, কোনও কথা নয় প্রকাশ। সেই কথায় আছে না, বৌ মলে বৌ পাওয়া যায়, কিন্তু ভাই মলে ভাই পাওয়া যায় না।

পরেশ বললে, না না, তা হবে না। তা কিছুতেই হতে পারে না

আমার এই অপরাধের বোঝা বৌদির ঘাড়ে চড়াবো? আমি? কখ্‌খনো না।

চরণ-উকিল বললে, কেন, এতে ক্ষতিটা কি?

—কি ক্ষতি তা আপনি বুঝবেন না। আপনি উঠুন।

এদের কথা শুনতে পেয়ে বোধকরি মলিনা এসে দাঁড়িয়েছিল ঘরের ভেতরের দিকের বন্ধ দরজাটার পাশে। বললে, কে কথা বলছো এঘরে?

সব চুপ হয়ে গেল। প্রকাশ তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

পরেশ চরণ-উকিলের হাতটা ধরে তাকে টেনে তুলে দিয়ে চুপি-চুপি বললে, আপনি যান। ওদিকে বৌদি—

চরণ কিন্তু বৌদির খাতির করলে না। যাবার আগে বলে গেল, কিন্তু মনে থাকে যেন, বৌ মলে বৌ পাওয়া যায়, ভাই মলে ভাই পাওয়া যায় না।

রাস্তায় নেমে ওদিকের সদর দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকলো প্রকাশ। মলিনা বললে, কে? ও, তুমি! বাইরের ঘরে ঠাকুরপো রিহার্স্যাল দিচ্ছে নাকি?

প্রকাশ বললে, হুঁ।

মলিনা বললে, এক্ষুনি এলো তাহ'লে। শঙ্কর ডাকতে এসেছিল, আমি বলে দিলাম, নেই। কানাইটার মজা ছাখো। সকাল-সকাল খেয়ে আমার ছুটি করে দেবে, তা না—এখনও তার দেখা নাই। মরুকগে, তুমি খেয়ে নাও। খেয়ে নিয়ে তুমিই যাও একবার। কানাইকে পাঠিয়ে দাওগে।

প্রকাশ একটা কথাও বললে না। সোজা সে তার নিজের ঘরের দিকে এগিয়ে গেল।

মলিনা বললে, ঠাকুরপো রিহার্স্যাল দিচ্ছিল—বেশ কথাটি। বৌ মলে বৌ পাওয়া যায়, ভাই মলে ভাই পাওয়া যায় না। হ্যাঁ গা, আমি মলে তুমি আবার বিয়ে করবে?

প্রকাশ কিছু বলবার আগেই বাইরে থেকে আবার একটা ছেলে ডেকে উঠলো, পরেশদা! পরেশদা!

চরণ-উকিলের গলার আওয়াজ শোনা গেল। সে বললে, পরেশ আজ আর যাবে না। থিয়েটার তোরা বন্ধ করে দিগে যা!

ছেলেটা বললে, কেন? কি হয়েছে?

চরণ বললে, খুন-খারাপি হয়ে গেছে বাবা। সর্বনাশ হয়ে গেছে। সেই যে কানা ছেলেটা ছিল প্রকাশের বাড়ীতে, সেই ছেলেটা মরে গেছে।

কথাটা শুনতে পেলে মলিনা। শুনে শিউরে উঠলো।

—উকিলবাবু এ কি বললেন? এ কি সর্বনেশে কথা!

বলতে বলতে বাইরের ঘরের দরজায় ধাক্কা মেরে মলিনা ডাকলে, ঠাকুরপো! ঠাকুরপো!

পরেশ ভেতর থেকে দরজা খুলে দিলে। মলিনা ঘরে ঢুকলো।

কানাই শুয়ে আছে পরেশের বিছানায়।

মলিনা চীৎকার করে উঠল, কানাই! বলেই সে থর্‌থর্‌ করে কাঁপতে কাঁপতে কানাই-এর কাছে গিয়ে বসলো।

পরেশ আছাড় খেয়ে পড়লো বৌদির পায়ের কাছে। কাঁদতে কাঁদতে বললে, আমিই ওকে মেরে ফেলেছি বৌদি, আমিই ওকে মেরে ফেলেছি। কানা বলেছিলাম তাই ও আমাকে একটা ইঁট ছুঁড়ে মেরেছিল, আমি আবার সেই ইঁটটা ওর দিকে ছুঁড়ে মেরেছিলাম। তাতেই ও মরে যাবে আমি ভাবতে পারিনি।

মলিনা কিন্তু একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে কানাই-এর মুখের দিকে। দরদর করে দু'চোখ দিয়ে জল নেমে এসেছে। মুখে একটি কথাও সরছে না। থর্‌-থর্‌ করে কাঁপছে শুধু।

খবরটা পৌঁছে গেছে বস্তির মাঠে।

হৈ হৈ করে ছেলেয়-বুড়োয় প্রায় জন-পঞ্চাশেক এসে দাঁড়ালো

প্রকাশের দরজায়। ফণীবাবু, বিশু, পান্নালাল, কেনারাম—পাড়া প্রতিবেশী যারা, তারা এলো সকলের আগে আগে।

ফণীবাবু ডাকলেন, প্রকাশ! প্রকাশ!

প্রকাশ বেরিয়ে এলো। মুখে কথা নেই। উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি।

ফণীবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, কি হয়েছে প্রকাশ?

এতক্ষণে প্রকাশ যেন একটা আশ্রয় পেলে। বললে, হ্যাঁ—ইয়ে—পরেশ, কানাই—

চোখ দুটো তার জলে ভরে এসেছে। কিছুই ভাল করে বলতে পারছে না।

ফণীবাবুই কথাটা পরিষ্কার করে দিলেন। বললেন, কানাই মারা গেছে?

—হ্যাঁ। হ্যাঁ। কানাই মারা গেছে।

ফণীবাবু চিন্তিত হলেন। বললেন, ঠিকই শুনেছি তাহলে। এখন কি করা যায়?

—কিছু করতে হবে না। বলতে বলতে ভিড় ঠেলে এগিয়ে এল চরণ-উকিল। বললে, আমি সব ঠিক করে দিয়েছি।

ফণীবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, কি ঠিক করলে?

চরণ বললে, থানায় টেলিফোন করে দিলাম।

ফণীবাবু চরণের মুখের দিকে তাকালেন। বললেন, টেলিফোন করবার আগে আমাকে একবার জিজ্ঞাসাও করলে না?

—জিজ্ঞাসা কি করবো? জিজ্ঞাসা করবার আছে কি?

—তোমার কাছে কিছু না থাকতে পারে। তুমি উকিল। এইরকম একটা কিছু পেলে বেঁচে যাও। কিন্তু—

বলেই ফণীবাবু প্রকাশকে দেখিয়ে দিয়ে বললেন, এই লোকটাকে বাঁচাবার কথা কিছু ভেবেছ?

চরণ বললে, নিশ্চয় ভেবেছি। যা ভেবেছি তা আমি আগেই বলে দিয়েছি প্রকাশকে।

একটা জিপগাড়ী এসে দাঁড়ালো শিউলিতলা লেনের সামনে। ছেলেগুলো হৈ হৈ করে উঠতেই সকলের নজর পড়লো সেইদিকে। খলে থানা থেকে দারোগাবাবু এসেছেন।

চরণ এগিয়ে গিয়ে বললে, নমস্কার।

দারোগাবাবু বললেন, বাজি পোড়ানোর ব্যাপার নাকি ?

চরণ বললে, আজ্ঞে না। মাসী-বোনপোর ঝগড়া।

প্রকাশের কাছে সত্য কথাটা ফণীবাবু তখন জেনে নিয়েছেন। হাত দিয়ে চরণকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বললেন, তুমি চুপ কর চরণ। তুমি একটি কথা বলবে না বলে দিচ্ছি।

চরণ বললে, বা রে, আমি উকিল, আমি কথা বলবো না ?

—না। ফণীবাবু বললেন, কথা বলতে হয় আদালতে বলবে, এখানে নয়।

দারোগাবাবু বললেন, উকিলের উপর আপনার এত রাগ কেন ফণীবাবু ?

—না না রাগ নয়। ফণীবাবু বললেন, আসামী যেখানে স্বয়ং উপস্থিত, সেখানে আর কারো কথা বলা উচিৎ নয়।

চরণের রাগ হয়ে গেল। ফণীবাবুকে ছেড়ে সে প্রকাশের দিকে তাকিয়ে বললে, প্রকাশ, আমি তাহলে চুপ করলাম। যা করতে হয় ফণীবাবুই করুন।

দারোগাবাবু বললেন, পূজোর দিন, নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করবেন না। ঘটনাটা কোথায় ঘটেছে বলুন ?

চরণ কথা না বলে থাকতে পারলে না। বললে, ঘরের ভেতর।

ফণীবাবু বললেন, আজ্ঞে না। এইখানে, এই রাস্তার ওপরে।

দারোগাবাবু বললেন, লাশ কোথায় ?

—ঘরে।

দারোগাবাবু কনেষ্টবলকে হুকুম করলেন, লোকজন হঠাও। চলুন ফণীবাবু, ঘরের ভেতর বসে ডায়েরীটা লিখি।

ফণীবাবু বললেন, চলুন।

চরণ বলে উঠল, যান আপনারা আমি কিছু জানি না।

দারোগাবাবু বললেন, উকিলবাবুকে চটিয়ে দিলেন ফণীবাবু? রাগ করে চলে যাচ্ছেন যে?

ফণীবাবু বললেন, রাগ একটু করা ভালো। প্রকাশ, যাও, দারোগাবাবুকে ঘরে নিয়ে গিয়ে বসাও।

প্রকাশ নিতান্ত অসহায়ের মত দারোগাবাবুকে সঙ্গে নিয়ে বাইরের ঘরে গিয়ে কানাইএর মৃতদেহটার দিকে আঙুল বাড়িয়ে বললে, ওই দেখুন।

ফণীবাবু যাননি কোথাও, চরণের পিছু পিছু গিয়ে তার জামাটা চেপে ধরলেন। বললেন, যাচ্ছো কোথায়?

চরণ বললে, বাড়ী যাচ্ছি। এখানে দাঁড়িয়ে থেকে কি লাভ?

—লাভ কি সব সময় হয় রে ভাই? মাঝে মাঝে লোকসানও সহ্য করতে হয়!

চরণের রাগ তখনও পড়েনি। বললে, লোকসান সহ্য করবার ক্ষমতা আমার নেই ফণীবাবু, লোকসান আপনি সহ্য করুন। আমি বাড়ী চললুম।

ফণীবাবু ছাড়লেন না। বললেন, তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।

—বলুন কি কথা।

ফণীবাবু একটু আড়ালে টেনে নিয়ে গেলেন চরণকে। বললেন, উকিল হয়ে কি পরামর্শ তুমি দিয়েছ প্রকাশকে? কি বলেছ?

—যা বলেছি, তা তো আপনি দিলেন সব গোলমাল করে।

ফণীবাবু বললেন, সত্যি কথা বললে বুঝি গোলমাল করা হয়?

—হ্যাঁ হয়।

—আর সেইজন্যেই তুমি প্রকাশকে বলেছ মিথ্যার আশ্রয় নিতে? বলেছ প্রকাশের স্ত্রী এই ছেলেটাকে মেরে ফেলেছে?

চরণ বললে, হ্যাঁ বলেছি। এই কথা বললে সুবিধে হতো।

ফণীবাবু বললেন, মিথ্যে কথা বলে সুবিধে হয়েছে, মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে মানুষ জয়লাভ করেছে, তার একটা দৃষ্টান্ত তুমি আমাকে দেখাতে পার?

চরণ বললে, একটা কি বলছেন ফণীবাবু? অনেক দেখাতে পারি। হাজার হাজার। এখানে এই রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ও-সব কথা হয় না ফণীবাবু আমার সঙ্গে দয়া করে একদিন আদালতে যদি যান, দেখিয়ে দেবো মিথ্যার জয় জয়কার। দেখিয়ে দেবো—সত্যের মুখোস পরিয়ে মিথ্যাকে আমরা কেমন করে সাজিয়ে দিই।

—শেষ পর্যন্ত মিথ্যার মুখোস একদিন খসে পড়ে। সত্যের জয় হয়।

—সব সময় নাও হ'তে পারে।

ফণীবাবু বললেন, ভুল বলছো চরণ, মিথ্যার জয় যেদিন হবে এ-পৃথিবী সেদিন হবে বাসের অযোগ্য। তোমার আদালতের কাণ্ড-কারখানা আমি জানি না। কিন্তু আদালতের বাইরে যে-পৃথিবীতে আমরা বাস করে রয়েছি সেখানে, যে-বিশ্বাস নিয়ে আমি বেঁচে আছি, আমার সে বিশ্বাস তুমি ভেঙ্গে দেবার চেষ্টা কোরো না চরণ।

—কে আপনার সে বিশ্বাস ভাঙতে যাচ্ছে? আপনিই তো নিজে থেকে সব-কিছুতে নাক গলাতে যান। আইন কানুন মামলা মোকদ্দমার ব্যাপার কিছু যখন জানেন না, তখন আর জানবার চেষ্টা করবেন না।

ফণীবাবু বললেন, চুলোয় যাক্ তোমার আইন-কানুন, মামলা-মোকদ্দমা! ও-সব জানি না জানতে চাইও না। তবে এইটুকু শুধু জানি, নিরীহ এক ভদ্রলোকের স্ত্রীকে বিনা অপরাধে আজ যদি পুলিশের সঙ্গে গিয়ে হাজতবাস্ করতে হয়, তাহলে শুধু ওই প্রকাশ পরেশের ইজ্জৎ যাবে না, ইজ্জৎ যাবে তোমার আমার, আর এই

শিউলিতলা লেনে যতগুলো মানুষের মতন জানোয়ার বাস করে—সকলের।

চরণ বললে, দেখুন ফণীবাবু, আপনাকে আমি সাবধান করে দিচ্ছি। এই বুড়ো বয়সে নিজেকে আর খুনের ব্যাপারে জড়িয়ে বিপদে পড়বেন না।

ফণীবাবু বললেন, তা পড়ি পড়বো। একটা কথা আছে সেটা অবশ্য তোমার আইনের বইএ লেখা নেই—রাজদ্বারে শ্মশানে চ য তিষ্ঠতি স বান্ধবঃ। এসো আমার সঙ্গে, ওখানে কি হচ্ছে দেখি।

প্রকাশের বাইরের ঘরের জানালার কাছে ফণীবাবু এসে দাঁড়ালেন। সঙ্গে চরণ উকিল। দেখলেন, দুটো লোক ষ্ট্রেচার নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে মৃতদেহ নিয়ে যাবার জন্যে। ওদিকে দারোগা-বাবু পড়েছেন মহা বিপদে।

পরেশ বলছে, সে খুন করেছে।

মলিনা বলছে, না, ঠাকুরপো খুন করেনি, আমি করেছি।

ফণীবাবুকে দেখেই দারোগাবাবু বলে উঠলেন, দেখুন ফণীবাবু, আমার অবস্থাটা একবার দেখুন। ইনিও বলছেন খুন করেছেন।

ফণীবাবু বললেন, কার কথাটা সত্য বলে বিশ্বাস হচ্ছে আপনার?

চরণ বললে, ওঁর বিশ্বাস অবিশ্বাসে কিছু আসে যায় না।

ফণীবাবু বললেন, তুমি থামো চরণ, আমিও তা জানি।

চরণ বললে, না জানেন না। এটা হলো গিয়ে আইন।

ফণীবাবু এক ধমক দিলেন। বললেন, আবার আইন।

ধমক খেয়ে চরণ চুপ করে গেল।

কানাইএর মৃতদেহ ষ্ট্রেচারে তোলা হচ্ছে। মলিনা কানাইকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছে। মেয়েরা যেমন করে কাঁদে তেমনি করেই কাঁদছে।—থিয়েটার দেখতে যাবি বলে খেতে এসেছিলি কানাই, না খেয়েই চলে যাচ্ছিস বাবা।

কথাগুলো শুনে দারোগাবাবুর চোখদুটোও ভিজে ভিজে মনে হচ্ছিল।

ফণীবাবু ডাকলেন, পরেশ।

পরেশ ফণীবাবুর কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই তিনি তাকে একটু সরিয়ে নিয়ে গিয়ে চুপিচুপি বললেন, পূজোর সময় হাজতে থাকবি হতভাগা?

পরেশ মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইলো।

ফণীবাবু বললেন, যা পালা।

—কোথায় পালাব?

ফণীবাবু বললেন, এখন পান্নালালের ছাতে গিয়ে থাক, তারপর একসময় ফিরে আসবি বাড়ীতে।

সবারই নজর ছিল কানাইএর মৃতদেহের দিকে। লোকজনের ভিড়ের ভেতর দিয়ে পরেশ কখন চলে গেল কেউ জানতেও পারলে না।

ষ্ট্রেচারের সঙ্গে সঙ্গে মলিনা বেরিয়ে যাচ্ছিল রাস্তায়।

ফণীবাবু প্রকাশকে ডেকে বললেন, ওকে বাড়ীতে ফিরিয়ে আনো।

দারোগাবাবু যাবার সময় পরেশের খোঁজ করলেন। কিন্তু ডাকাডাকি করে কোথাও তাকে খুঁজে পাওয়া গেল না।

আসামী পালিয়েছে।

শিউলিতলা লেনকে স্তম্ভিত করে দিয়ে বিচিত্র এক সংবাদ নিয়ে এলেন দারোগাবাবু। কানাইএর মাথা থেকে বেরিয়েছে রিভলবারের একটা বুলেট্। সুতরাং পরেশের ইঁটের ঘায়ে সে মরেনি। মরেছে রিভলবারের গুলিতে।

কিন্তু কে চালালে এই রিভলবার? শিউলিতলা লেনে কারও বাড়ীতে বন্দুক নেই, রিভলবারও নেই।

তবু সার্চ ওয়ারেণ্ট এলো শিউলিতলা লেনে।

ফণীবাবুর বাড়ী থেকে আরম্ভ করে প্রতিটি বাড়ী তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখা হলো। রিভলবার বন্দুক দূরের কথা, প্রকাশের একটি মোটা ছড়ি ছাতা ছাড়া কারও বাড়ীতে একটা লাঠি পর্যন্ত পাওয়া গেল না।

দারোগাবাবু বললেন, তাজ্জব ব্যাপার। এ যেন সেই ডিটেকটিভ নভেলের মত হ'লো মশাই, পরেশ নিজের মুখে সব স্বীকার করে পালিয়েই বা গেল কেন তাও তো বুঝতে পারছি না।

ফণীবাবু বললেন, পূজোর সময় হাজতবাস করতে ইচ্ছে হলো না বোধহয়।

—কিন্তু এখন সে অনায়াসে হাজির হতে পারে।

ফণীবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার কি মনে হয় সে নির্দোষ?

দারোগাবাবু বললেন, মাথা থেকে বুলেট যখন বেরিয়েছে, তখন পরেশের ইঁটের ঘায়ে যে মরেনি সেটা বুঝতে পারছি। বুঝতে পারলেও আমার কিছু বলা উচিত নয়। বিচারে যা সাব্যস্ত হয় তাই হবে।

দারোগাবাবু চলে যাবার পর, শিউলিতলা লেন শুধু এই আলোচনায় সরগরম হয়ে উঠলো।

বুলেট দিয়ে কে মারলে ছেলেটাকে?

কানাইএর এমন শত্রু কে থাকতে পারে, যে তাকে এমন নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করবে?

যে মারলে সে কোনদিক থেকে কোথায় দাঁড়িয়ে মারলে?

মেরেই সঙ্গে সঙ্গে পালিয়েই বা গেল কেমন করে?

চরণ উকিল বললে, রাস্তার এই আলোটা তো নষ্ট হয়ে গেছে, এইটে জ্বলেনি। একটা লোক ধরুন এইখান থেকে রিভলবার চালিয়ে এই গলিটার, আর না হয় ফণীবাবুর দোরের পাশে লুকিয়ে

দাঁড়িয়ে রইলো. তারপর পরেশ ঘরে ঢুকে যাবার পর বেরিয়ে চলে গেল—কে দেখবে তাকে ?

বিশু বললে, রিভলবারের আওয়াজটা ? সেটা তো লুকোবে না।

ফণীবাবু হেসে উঠলেন। বললেন, বিশুর কথা শোন। নিজে আওয়াজের দোকান করেছে, বাজি বিক্রি করছে. আর বলছে আওয়াজটা লুকোলো কেমন করে ?

চরণ বললে, চব্বিশ ঘণ্টাই তো আওয়াজ হচ্ছিল সে-সময়। আওয়াজে আওয়াজ মিশে গেছে।

বিশু বললে, তা সত্যি। গাদ্দা গুড়ুমের আওয়াজ কামান। বন্দুকের আওয়াজের চেয়ে বেশি।

চরণ-উকিল বললে, কিন্তু মারলে কে ?

ফণীবাবু বললেন, যেই মারুক, পরেশটা বেঁচে গেল। বেচারা প্রকাশ ভাইএর দুঃখে পাগলের মত হয়ে গেছে।

চরণ বললে, কিন্তু ধরুন, আমি যদি বলি পরেশই মেরেছে ওকে রিভলবার দিয়ে। সেইটে গোলমাল করে দেবার জন্যে বলছে আমি ছোট একটা ইঁট ছুঁড়েছিলাম মাত্র।

ফণীবাবু বললেন, এই রকম বুদ্ধি না হলে তুমি ওইরকম উকিল হও। পরেশের যদি কানাইকে মারবার উদ্দেশ্য থাকতো তাহলে সে কানাইএর মৃত দেহটা যেমন ছিল তেমনি ফেলে রেখে দিয়ে তাড়াতাড়ি সিরাজদ্দৌলা সেজে থিয়েটার আরম্ভ করে দিত।

চরণ বললে, পরেশ পালিয়ে গেল কেন ?

ফণীবাবু বললেন, পরেশ কেন পালিয়ে গেল সে-কথা না জেনে তুমি তোমার বুদ্ধি খরচ করে বের করে দাও দেখি কে এই বুলেট মারলে ?

পরেশ ধরা দিয়েছে।

কিন্তু প্রথম শুনানির দিনেই ফণীবাবু জামিনে তাকে খালাস

ক'রে এনেছেন। সাতদিন পরে আর-একটা দিন পড়েছে। উকিল বলেছেন, খুন ও করেনি। বিচারকেরও তাই ধারণা। ফণীবাবু তাঁর রকে বসে গল্প করছিলেন বিশুর সঙ্গে।

ওদিকে তাঁর বাড়ীর উঠানে তখন একটা বিশ্রী ব্যাপার চলেছে! বাড়ীর চাকর বনমালীকে সুন্দর একটা ছড়ি দিয়ে বেধড়ক পেটাচ্ছে আর বলছে, Stupid, Rascal, বলে কিনা খেয়ে ফেলেছি। You have eated it Rascal. বল্ কোথায় রেখেছিস্, নইলে তোকে আমি আজ মেরেই ফেলব।

বাবারে, মারে বলে বনমালী চীৎকার করছে আর বলছে, মরে যাব বড়বাবু, আর মারবেন না।

বনমালীর কান্না শুনে ফণীবাবু বাড়ী ঢুকলেন। বললেন, ওকে ওরকম করে মারছ কেন সুন্দর? কি হয়েছে?

বনমালী ছুটে গিয়ে ফণীবাবুর পা দুটো জড়িয়ে ধরলে, আপনি বাঁচান কত্তাবাবু, মরে গেলাম।

—আঃ, কি হয়েছে বল্ নারে বাবা, কি হয়েছে? সুন্দর।

সুন্দর বল্লে, তুমি আবার for nothing এলে কেন বাবা, তুমি যাও। ব্যাটা rascal, বলে কিনা, I have eated it up. খেয়ে ফেলেছে।

বনমালী তখনও বলছে, হ্যাঁ বাবু, আমি খেয়ে ফেলেছি।

সুন্দর বললে, ব্যাটা এখনও বলছিস।

এই বলে সে আবার ছড়ি তুললে তাকে মারবার জন্যে।

বনমালী আবার চেঁচিয়ে উঠতেই ফণীবাবু বললেন, কি খেয়েছিস তাই বল না রে বাবা।

ফণীবাবুর বাড়ীতে গাই ছিল একটা। দুধ যারা বিক্রি করে তাদের কাছ থেকে জল দেওয়া দুধ তিনি কিনতেন না। সেই গাইএর জন্যে টালির একটা চালাঘরে কাটা খড়ের একটা গাদা

ছিল, সেই খড়ের গাদাটা দেখিয়ে সুন্দর বললে, এইখানে that thing I kept in secret.

বনমালী বলে উঠল, হাঁ বাবু, ও কেপেষ্টেন সিগ্রেট।

ফণীবাবু বড় বিপদে পড়লেন। ছেলে বাপের কাছ থেকে আঙুল আড়াল দিয়ে সিগারেট খায় তা তিনি জানেন। কিন্তু এই নিয়ে কিছু বলতে লজ্জাও করে, অথচ না বললেও নয়। তাই বললেন, ছি ছি, এই জন্যে ওকে মারছো তুমি? তা বেশ করেছিস, খেয়েছিস। তোমার সবেতেই বাড়াবাড়ি। সুন্দর, দাও তুমি তোমার ওই ছড়িটা আমাকে দাও। ওটা হাতে থাকলেই তুমি ওকে পিটোবে।

এই বলে সুন্দরের হাত থেকে ছড়িটা একরকম কেড়ে নিয়েই তিনি চলে যাচ্ছিলেন, এমন সময় বাড়ীর ঠাকুর ঢুকলো।

ঠাকুরকে দেখে বনমালী চাকরটা যেন একটা আশ্রয় পেলে। তাড়াতাড়ি তার কাছে গিয়ে বললে, তুমি তো জানো, আমি সেই সিগারেট খেয়ে ফেলেছিলাম বলে দাদাবাবু আমাকে মেরে শেষ করে দিলে।

সুন্দর বললে, না না সিগারেট নয়।

ঠাকুর বললে, আমি জানি দাদাবাবু সিগ্রেট নয়। এই নিন আপনার জিনিস।

এই বলে ঠাকুর তার বটুয়ার ভেতর হাত ঢুকিয়ে বললে, ওই বনমালী চুরি করে আমার পান খেয়ে নেয় বলে আমার এই বটুয়াটি ওই খড়ের গাদায় লুকিয়ে রাখি। কাল এই বটুয়াটি আনতে গিয়ে জিনিসটি হাতে ঠেকলো। আপনাকে পেলাম না বলে এটি আমি বাসায় নিয়ে গিয়েছিলাম।

বলে যে জিনিসটি সে বটুয়া থেকে বের করলে, মনে হলো যেন এইটির জন্যেই সুন্দর এতক্ষণ ধরে ছট্‌ফট্‌ করছিল। ঠাকুরের হাত থেকে সেটি সে চট্‌ করে কেড়ে নিয়ে তার প্যাণ্টের পকেটে

ঢুকিয়ে রাখতে যাচ্ছে, এমন সময় ফণীবাবু তার কাছে এসে হাত বাড়ালে, কই দেখি ওটা কি।

সুন্দর বললে, ও কিছু নয় বাবা, nothing, nothing. I tell you father, catching your leg, I request you—দেখবার জন্যে ফণীবাবুর জেদ চড়ে গেল। বেশ জোরগলায় বললেন দেখি।

ঠাকুর চাকর হাঁ করে দাঁড়িয়ে ছিল।

—তোমরা দাঁড়িয়ে কি দেখছো? যাও এখান থেকে।

বলে যেই তিনি ঠাকুর চাকরের দিকে চোখ ফিরিয়েছেন, সুন্দর ছুটে পালিয়ে গেল।

ফণীবাবু ছুটলেন তার পিছু পিছু—সুন্দর। সুন্দর।

সুন্দরের ইচ্ছা ছিল শিউলিতলা লেন থেকে বেরিয়ে বড় রাস্তায় চলে যাবার, কিন্তু ওদিক থেকে বিশু আসছিল। ফণীবাবু পেছন থেকে বললেন, বিশু ধর সুন্দরকে।

বিশু হাত বাড়াতেই সুন্দরকে ফিরতে হলো।

ফিরে সে যাবে কোথায়? ডানদিকে দেখলে প্রকাশের বাড়ীর দরজাটা খোলা। চট্ করে সেইখানে সে ঢুকে পড়লো।

মলিনা রান্নাঘরে মনমরা হয়ে বসে বসে কাজ করছিল, পরেশ কোথায় বেরিয়ে গেছে, প্রকাশ বসেছিল তার ঘরে। বসে বসে মোটা একখানা হোমিওপ্যাথী বই পড়ছিল। হুড়মুড় করে ঘরের ভেতর ঢুকে পড়লো সুন্দর। চীৎকার করে বলে উঠলো, Save me, save me sir from my father's hand.

চমকে উঠেছিল প্রকাশ। বললে, কি হলো? কি হয়েছে?

—আমি বলছি কি হয়েছে। ঘরে ঢুকলেন ফণীবাবু।

—এই যে ফণীবাবু বসুন বসুন। বলতে বলতে উঠে দাঁড়ালো প্রকাশ।

—না বসবো না। বলেই ফণীবাবু বাঁ-হাত দিয়ে সুন্দরের

জামার কলারটা চেপে ধরে বললেন, দেখি ও জিনিসটা দাও আমার হাতে।

ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছিল সুন্দর।

তবু সে বলতে ছাড়লে না।—No, no, no father, no আমার বয়েস হয়েছে, এখন আর ছোট ছেলের মত আমার গায়ে হাত দিও না বাবা। ও-জিনিস আমার নয়, পরের জিনিস আমায় রাখতে দিয়েছে।

ফণীবাবু বললেন, তা দিক। তবু আমি দেখবো। আমার সন্দেহ হয়েছে।

—সন্দেহ? আমাকে? সুন্দর বললে, you are suspectering your own son?

—হ্যাঁ, আমার কুলাঙ্গার পুত্র তুমি। এখনও বলছি—বের কর, বের কর।

আর রুখতে পারলে না সুন্দর। থর্‌থর্ করে কাঁপতে কাঁপতে প্যাণ্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে ধীরে ধীরে যে জিনিসটি সুন্দর বের করলে সেটি দেখে চমকে উঠলেন ফণীবাবু। চমকে ওঠবার কথাই। ছোট একটি আমেরিকান পিস্তল।

পিস্তলটি হাতে নিয়ে দেখলেন তিনি। হাতটা তাঁর কাঁপছে। কাঁপতে কাঁপতে সেটি তিনি নিজের ফতুয়ার পকেটে রাখলেন। বাঁ-হাতটা দিয়ে তখনও তিনি সুন্দরকে ধরে রেখেছেন।

সুন্দর হাত বাড়িয়ে বললে, দাও ওটা। তোমার পকেটে রাখলে কেন?

—কেন রাখলাম?

ফণীবাবু আর কথা বলতে পারছিলেন না। গলাটা তাঁর ভারি হয়ে এসেছিল। তবু বললে, এ-কাজ তাহলে তোমার?

সুন্দর বললে, কোন কাজ?

ফণীবাবু চীৎকার করে উঠলেন, কানাইকে তাহলে তুমি মেরেছ?

সুন্দরও তেমনি চীৎকার করে উঠলো, No, No.

সুন্দরের ভয়ার্ত কণ্ঠ চাপা দিয়ে ফণীবাবু বললেন, মিথ্যা বোল না। আমি তোমার বাবা। সত্যি কথা বলো।

সুন্দর আর পারছে না নিজেকে সামলাতে। বললে, yes, সত্যি বলছি, কানাইকে মারতে আমি চাইনি। আমি মারতে চেয়েছিলাম পরেশকে। কিন্তু আমার হাত কেঁপে গেল, অন্ধকারে কি হলো কিছু বুঝতে পারলাম না। তাড়াতাড়ি বাড়ীতে ঢুকে পড়লাম।

—পরেশকে মারতে গিয়েছিলে কেন? ফণীবাবু জিজ্ঞাসা করলেন।

সুন্দর বললে, পরেশ আমাকে জুতো মারতে গিয়েছিল। পরেশ আমাকে মেরেছিল, অপমানের কিছু বাকি রাখেনি।

—কিন্তু কেন অপমান করেছিলাম সেটা বল তোমার বাবাকে।

সবাই ফিরে তাকিয়ে দেখলে, পরেশ এসে দাঁড়িয়েছে দোরের কাছে।

সুন্দর পরেশের দিকে কটমট করে তাকিয়ে বললে, you Rascal, রিণিকে আমি চাকরি দিতে চেয়েছিলাম আমার কোম্পানীতে, তাতে তোমার কি? রিণি তোমার কে?

পরেশ তার পকেট থেকে রিণিকে লেখা সুন্দরের সেই চিঠিখানা বের করলে। তারপর সেখানি ফণীবাবুর হাতে দিয়ে বললে, এইটে পড়ুন। রিণির দাদা যেদিন নৈহাটি গিয়েছিল সেই দিন রিণির দাদার পথের মাঝে এ্যাক্সিডেণ্ট হয়েছে বলে সুন্দরদা মিছেমিছি এই চিঠিখানি লিখে রিণিকে নিয়ে গিয়ে তোলে তার আপিসে। তারপর তারা দুই বন্ধু মিলে—

ফণীবাবু বললেন, থাক্ আর বলতে হবে না। আমি বুঝতে পেরেছি।

এই বলে সুন্দরের চিঠিখানি পরেশের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ফণীবাবু সুন্দরকে বললেন, চল।

সুন্দর বললে, কোথায় ?

—যেখানে তোমার যাওয়া উচিত সেইখানে।

এই বলে আর কোনও কথা না বলে কারও দিকে না তাকিয়ে সুন্দরকে টানতে টানতে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

প্রকাশ তার পিছু পিছু গেল, ফণীবাবু! ফণীবাবু! শুনুন!

শোনা দূরে থাক্, পেছন ফিরে একবার তাকিয়েও দেখলেন না তিনি।

সোজা একেবারে থানায়।

বড় দারোগাবাবু বসেছিলেন একা। ফণীবাবু আর প্রকাশকে আসতে দেখে বললেন, নমস্কার। আসুন, আসুন। বসুন। দারোগাবাবু প্রকাশকে দেখে ভেবেছিলেন বুঝি পরেশের কথা জিজ্ঞেস করতে এসেছেন। প্রকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনার ভাই ছাড়া পাবে বলেই মনে হচ্ছে। এখন আসল কালপ্রিটকে ধরাই হচ্ছে আমাদের কাজ।

ফণীবাবু বললেন, সে কাজ আমি করেছি—এই দেখুন, এই ছেলেটি—this young man—

বলে তিনি সুন্দরকে দেখিয়ে বললেন, এই আসল কালপ্রিট। পকেট থেকে পিস্তলটি বের করে দারোগাবাবুর টেবিলের ওপর নামিয়ে দিলেন ফণীবাবু। বললেন, আর এইটি হলো সেই পিস্তল—যে পিস্তলের গুলিতে নিরীহ একটা ছেলে মারা গেছে।

পিস্তলটি নাড়াচাড়া করতে করতে দারোগাবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, পিস্তলটি কার ?

ফণীবাবু মুখ তুলে তাকাতে পারছিলেন না, তবু তাকালেন সুন্দরের দিকে। শুধু একবার তাকিয়ে চোখ নামিয়ে নিলেন। দাঁড়াতেও পারছেন না তিনি। বসে পড়লেন। সুন্দর বললে, আমার বন্ধু বিজনের কাছ থেকে পেয়েছি। কার তা আমি জানি না।

—লাইসেন্স আছে তো ? দারোগাবাবু বললেন।

ফণীবাবু চোখদুটো একবার তুলে বললেন, না থাকাই সম্ভব।

ডায়েরী খাতাটায় কারবন পেপার দিয়ে ঠিক করে নিলেন দারোগাবাবু। তারপর লিখতে লিখতে সুন্দরের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার নাম ?

—সুন্দর সরকার।

ফণীবাবু মুখ না তুলেই বললেন, আপনি বলবেন না, আপনি বলবেন না। তুমি বলুন।

দারোগাবাবু বললেন, কেন ?

জবাবটা এলো প্রকাশের মুখ থেকে। ফণীবাবু মাথা তুললেন না।

প্রকাশ বললে, ফণীবাবুর ছেলে।

দারোগাবাবুর মুখখানা হঠাৎ কেমন যেন হয়ে গেল। হাতের পেন্সিল থামিয়ে প্রকাশের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন।

প্রকাশ আবার বললে, ওই ওঁর একমাত্র সন্তান।

—বলেন কি ? দারোগাবাবু বললেন, এ যে আমি বিশ্বাস করতে পারছি না।

—বিশ্বাস করুন।

—এরকম মানুষও পৃথিবীতে আছে ?

প্রকাশ বললে, দেখতেই তো পাচ্ছেন। ওঁরা আছেন বলেই পৃথিবীটা এখনও বাসের অযোগ্য হয়নি।

ফণীবাবু বললেন, আঃ, প্রকাশ। ওঁকে লিখতে দাও।